ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)

কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি

(আল ফাওযুল কাবীর)

বাংলা অনুবাদ

মাওলানা মাহদী হাসান

ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)

কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি

(আল ফাওযুল কাবীর)

আরবী অনুবাদ

আল্লামা শেখ সাঈদ আহমদ পালনপুরী

মুহাদ্দিস, দারুল উলূম, দেওবন্দ, ভারত

বাংলা অনুবাদ

মাওলানা মাহদী হাসান

ফাযেল-এ দারুল উলূম, দেওবন্দ, ভারত

সম্পাদনা

মাওলানা মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা

(গ্রন্থ প্রণেতা ও টিভি ব্যক্তিত্ব)

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❐ বাংলাবাজার ❐ মগবাজার

www.pathagar.com

কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি (আল ফাওযুল কাবীর)

বাংলা অনুবাদ : মাওলানা মাহদী হাসান

সম্পাদনা : মাওলানা মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

ISBN : 978-984-90346-0-5

প্রকাশনায় : মক্কা পাবলিকেশন্স

❐ ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৯৩৭৪৮০

❐ কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা। ফোন :৯৬৭০৬৮৬, ০১৭১৫১০৬৫৫০

❐ ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা। ফোন : ৮৩৫৩১২৭, ০১৯২২৭০৪২১০

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ঈসায়ী

মাঘ, ১৪১৯ বাংলা

রবিউল আউয়াল, ১৪৩৪ হিজরী

কম্পোজ

আহসান কম্পিউটার

কাটাবন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২২১৯৫

মুদ্রণ

র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ

২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য : এক শত ত্রিশ টাকা মাত্র।

Quran Bakkher Mulniti (A great successfulness in explanations of the holy Quran) by **Imam Shah Waliullah Dehlovi (rh.)**, Translation in Bengoli Mawlana Mahdi Hasan Edited by Mowlana Md. Masum billah bin Reja Published by Makkah Publications, Book and Computer Complex, 38/3 Banglabazar. Dhaka-1100, First Edition February 2013, Price Tk. 130.00 only.

www.pathagar.com

বাংলা অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা। তাঁর পরিচয় এবং নির্দেশ মানুষের কাছে পেশ করার জন্য তিনি যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। সর্বশেষে উম্মতের কাছে প্রেরণ করেছেন সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। অসংখ্য দরূদ ও সালাম তাঁরই প্রতি।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে নাযিল করেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীম। এটি মানবজাতির পথনির্দেশক। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ ـ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

"এ গ্রন্থে কোন সংশয়-সন্দেহ নেই। যারা মুত্তাকী হতে চায় এটা তাদের জন্য হেদায়াত বা পথপ্রদর্শক।' (সূরা বাকারা-০২)

কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য এটি পথপ্রদর্শক। এখান থেকে সঠিক পথ খুঁজে বের করতে হলে একে ভালোভাবে বুঝতে হবে।

কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি মানুষের সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন অত্যন্ত অলৌকিক আঙ্গিকে। এর বর্ণনাভঙ্গি অলৌকিক। এর সঠিক বিন্যাস খুবই বিস্ময়কর। সুতরাং এটিকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য অধ্যয়নের একটা মূলনীতি থাকা খুবই জরুরি। তা নাহলে একেক জন একেক রকম বুঝে বসে থাকবে।

যুগে যুগে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে কুরআন বুঝার বা কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি সম্বলিত আমাদের এ বক্ষ্যমাণ পুস্তকটি এ ধারাবাহিকতারই একটি প্রয়াস।

উপমহাদেশের সর্বজনমান্য মনীষী সানাদুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) কুরআন ব্যাখ্যার গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূলনীতি এতে সন্নিবেশিত করেন। কয়েকজন বিদগ্ধ আলেম এটিকে আরবীতে ভাষান্তরিত করেন। তন্মধ্যে দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস হযরত শেখ সাঈদ আহমদ পালনপুরী সাহেবের আরবী অনুবাদটি বহুল প্রচলিত। প্রায় সব মাদ্রাসাতেই এ কিতাবটি পাঠ্যসূচিভুক্ত।

আহসান পাবলিকেশন-এর কর্ণধার জনাব মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়ার অনুরোধে মূল্যবান এ পুস্তকের অনুবাদের কাজে হাত দেই। বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থ সামনে রেখে সকলের জন্য সহজবোধ্য করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো হয়েছে এতে। তৌফিকদাতা তো আল্লাহ তা'আলা। গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটি সম্পাদন করতে পেরে তৌফিকদাতা রাব্বুল ইজ্জাতেরই শুকরিয়া আদায় করছি- اَلْحَمْدُ لِلّٰه

ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে আমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে বাধিত করতে আবেদন করছি।

আল্লাহ তা'আলা মূল গ্রন্থের মত এটিকেও কবুল করুন। লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক, পরিবেশক ও পাঠক সাধারণের জন্য এ অনুবাদকর্মকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন ॥

www.pathagar.com

গ্রন্থকার পরিচিতি

নাম ওয়ালীউল্লাহ। উপনাম আবুল ফাইয়াজ, উপাধি কুতুবুদ্দীন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী নামেই তিনি বিশ্বময় পরিচিত। পিতা হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর বংশের এবং মাতার বংশধারা মূসা কাজিম (রা.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

তিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.)-এর ওফাতের আশি বছর পর মুঘল সম্রাট বাদশাহ আলমগীর (র.)-এর ওফাতের চার বছর আগে ৪ শাওয়াল, ১১১৪ হিজরী মোতাবেক ১৭০২ ঈসায়ী সনে বুধবার সূর্যোদয়ের সময় তাঁর নানাবাড়ী মুজাফ্ফর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহীম এবং দাদা ওয়াজীহুদ্দীন সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বিখ্যাত আলিম ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে কুরআন মাজীদ শিক্ষার জন্য তাঁকে মক্তবে ভর্তি করা হয়। সাত বছর বয়সে কুরআন হিফয শেষ করেন। সাথে সাথে ফার্সি ভাষা পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাঁর বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি শরহে মোল্লা জামী আয়ত্ত করেন। তিন বছরে তিনি নাহু-ছরফে এমন যোগ্যতা লাভ করেন যে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও তাঁর সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হতেন। তিনি তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহীম (র.)-এর নিকট হাদীস-তাফসীর, তাসাউফ-আকাইদ, মানতিক-বালাগাত, লুগাত-দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান-জ্যোতির্বিজ্ঞান, অংক ইত্যাদি বিষয়ক কিতাব অধ্যয়ন করেন। এসব বিষয়ে তিনি পাণ্ডিত্যের পর্যায়ে উপনীত হন, তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের বছর। এরপর তিনি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য তাঁর পিতার হাতে বাইয়াত হন। আধ্যাত্ম্য চর্চার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর এ সফলতা দেখে পিতা তাঁর মাথায় দস্তারে ফযীলত বেঁধে দেন এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিস্তারের অনুমতি প্রদান করেন। তাঁর বয়স যখন চৌদ্দ বছর তখন তাঁর পিতা তাঁকে বিবাহ করান।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) পড়াশুনা এবং আধ্যাত্মিক ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায়ে রহীমিয়াতে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অন্বেষায় তিনি হেজায ভূমি সফর করেন। সেখানকার যেসব ওলামা-মাশায়েখ থেকে তিনি হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন তাঁরা হলেন– শেখ সুনাদী, শেখ আহমদ কুশাশী, সায়্যিদ আব্দুর রহমান ইদ্রিস, শামছুদ্দিন

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ইবনে আলা বাবেলী, শেখ ঈসা জাফরী, শেখ হাসান উজাইমী, শেখ আহমদ আলী এবং শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে সালিম বাসারী।

হেজায ভূমি থেকে ফিরে এসে তিনি অধ্যাপনার কাজ বিশেষ করে হাদীসের দারস আরো জোরেশোরে শুরু করেন। ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে থেকে তার কাছে অগণিত ছাত্র পড়তে আসে এবং তাঁর গভীর জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়। তিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসুদের জন্য হাউজে কাওসার।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি ও শিষ্য-শাগরিদগণের মাধ্যমে উপমহাদেশে সঠিক ইলমে নববীর প্রচার প্রসার ঘটান।

ভারতবর্ষে এমন কোন মুহাদ্দিস নেই যিনি শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) কে ডিঙ্গিয়ে সনদ অর্জন করেছেন। এই মর্মে তিনি হচ্ছেন 'সানাদুল হিন্দ'। উপমহাদেশে শাহ সাহেবের অবস্থান তুবা বৃক্ষের মত। যার শিকড় শাহ সাহেবের বাড়ীতে আর তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে প্রতিটি মুসলিমের ঘরে ঘরে।

ইলমে নববীর প্রত্যেক শাখায় রয়েছে তাঁর খুরধার লেখনী, বিশেষ করে হাদীস-তাফসীর এবং উভয় শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ে তাঁর লেখনী বিশ্বময় সমাদৃত।

তাঁর লেখনীসমূহ

* ফত্হুর রহমান (তরজমায়ে কুরআন)।
* আল ফাওযুল কাবীর। (উসূলে তাফসীর)।
* আল ইরশাদ ইলা মুহিম্মাতি ইলমিল ইসনাদ।
* হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা।
* ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত্তাকলীদ।
* আল আনসাফ ফী বয়ানি সাবিলিল ইখতিলাফ।
* ইযালাতুল খিফা আন খিলাফাতিল খুলাফা।
* আত্ তাফহিমাতুল এলাহিয়্যাহ।
* আল মুসাফফা শরহে মুয়াত্তা।

এ ছাড়াও আরো অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রয়েছে, যা তিনি রচনা করেছেন।

২৯ মুহাররম, ১১৭৬ হিজরী মোতাবেক ১৭৬৩ ঈসায়ী সনে দ্বিপ্রহরে ইলম ও মারিফতের এ সূর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রজিউন।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ১৩

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের পঞ্চজ্ঞান ॥ ১৫

পঞ্চইল্‌ম উপস্থাপনায় কুরআনে কারীমের বর্ণনাশৈলী ॥ ১৫

শানে নুযূল ॥ ১৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

তর্কবিদ্যা ॥ ১৭

মুশরিকদের আলোচনা ॥ ১৭

ইব্রাহীমী ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ ॥ ১৭

ইব্রাহীমী ধর্মের বিধি-বিধান ॥ ১৮

ইব্রাহীমী ধর্মের আকীদাহ ও বিশ্বাস ॥ ১৮

মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ॥ ১৮

শিরক ॥ ১৯

তুলনা দেয়ার ধারণা ॥ ২০

ধর্ম বিকৃতি ॥ ২০

পরকাল অস্বীকার ॥ ২১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অসম্ভব মনে করা ॥ ২১

মুশরিক দল যুগে যুগে ॥ ২২

শিরকের জবাব ॥ ২৩

ধর্ম বিকৃতির জবাব ॥ ২৪

পরকাল অস্বীকারের জবাব ॥ ২৪

শেষ নবীর অস্বীকারকারীদের জবাব ॥ ২৫

পুনর্জবাব ॥ ২৬

তাওরাত বিকৃতি ॥ ২৭

www.pathagar.com

অর্থগত বিকৃতির উদাহরণ ॥ ২৭
আয়াত গোপন রাখা ॥ ২৯
আল্লাহর নামে অপবাদ ॥ ৩০
শিথিলতা প্রদর্শনের কারণ ॥ ৩০
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অসম্ভব ভাবার কারণসমূহ ॥ ৩১
নবীগণের শরীয়তে ভিন্নতার কারণ ॥ ৩১
শরীয়তগুলোর পারস্পরিক বিরোধ ডাক্তারদের ব্যবস্থাপনার মতোই ইহুদী আলিমদের নমুনা ॥ ৩২
খ্রিস্টানদের আলোচনা, ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস এবং তার জবাব ॥ ৩২
প্রথম দাবির জবাব ॥ ৩৩
দ্বিতীয় দাবির জবাব ॥ ৩৩
খ্রিস্টানদের নমুনা ॥ ৩৪
ঈসা (আ)-কে শূলে চড়ানোর বিশ্বাস এবং তার জবাব ॥ ৩৪
পারাক্লিতের সুসংবাদের ব্যাপারে বিকৃতি ॥ ৩৫
মুনাফিক ॥ ৩৬
কার্যকলাপগত মুনাফিকীর বহির্প্রকাশ ॥ ৩৬
মুনাফিকীর উভয় প্রকার সম্পর্কে আলোচনা ॥ ৩৭
আল-কুরআনে মুনাফিকদের কথা আলোচনার উদ্দেশ্য ॥ ৩৮
আল-কুরআন চিরন্তন মহাগ্রন্থ ॥ ৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চইল্‌মের পরিশিষ্ট ॥ ৩৯
আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী ॥ ৪০
আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী সুনির্ধারিত ॥ ৪০
কুরআনে ঘটনা বর্ণনার আঙ্গিক ও লক্ষ্য ॥ ৪১
আল-কুরআনে বারবার উল্লিখিত ঘটনাবলী ॥ ৪২
মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণের দাওয়াত ॥ ৪৪
আইন সম্পর্কিত জ্ঞান ॥ ৪৫

www.pathagar.com

আইনি আলোচনার মূলনীতি ॥ ৪৫
বিকৃত ইবরাহীমী মতাদর্শের সংস্কারে ইসলামী শরীয়তের অবদান ॥ ৪৫
কুরআন সংক্ষিপ্তাকারে এবং হাদীস সবিস্তারে বর্ণনা উপস্থাপন করে ॥ ৪৬
যেসব সংক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যাখ্যার দাবি রাখে ॥ ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআনের সাহিত্যশৈলী বর্ণনাভঙ্গির দরুন উদ্ভূত দুর্বোধ্যতা ও তার সমাধান ॥ ৪৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনের বিরল ব্যবহৃত শব্দাবলীর ব্যাখ্যা ॥ ৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতে نَسْخ এর সংজ্ঞা ॥ ৫২
পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতে 'মান্‌সুখ' বা রহিত আয়াতের সংখ্যা ॥ ৫২
মুতাআখ্‌খিরীন বা পরবর্তী ওলামাদের মতে 'মান্‌সুখ' বা রহিত আয়াত ॥ ৫৩
সূরা বাকারার ৬টি আয়াত ॥ ৫৩
সূরা আলে ইমরান থেকে ১টি আয়াত ॥ ৫৯
সূরা নিসা থেকে ৩টি আয়াত ॥ ৬০
সূরা মায়িদা থেকে ৩টি আয়াত ॥ ৬২
সূরা আনফাল থেকে ১টি আয়াত ॥ ৬৫
সূরা বারাআত থেকে ১টি আয়াত ॥ ৬৬
সূরা নূর থেকে ২টি আয়াত ॥ ৬৮
সূরা আহযাব থেকে ১টি আয়াত ॥ ৭০
সূরা মুজাদালা থেকে ১টি আয়াত ॥ ৭২
সূরা মুমতাহিনা থেকে ১টি আয়াত ॥ ৭২
সূরা মুয্‌যাম্মিল থেকে ১টি আয়াত ॥ ৭৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শানে নুযূল পরিচিতি ॥ ৭৫
হাদীসের যেসব বর্ণনার সাথে শানে নুযূলের সম্পর্ক নেই ॥ ৭৬
শানে নুযূলের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরের জন্য জরুরি ॥ ৭৭

www.pathagar.com

মুফাস্‌সির আলিমের জন্য দু'টো ব্যাপার জরুরি ॥ ৭৭
আহলে কিতাবদের বর্ণনা থেকে নবীগণের কাহিনীর উপকরণ গ্রহণ করা ॥ ৭৭
কিছু আয়াত যার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা নেই ॥ ৭৮
আয়াতের ব্যাখ্যাকে প্রশ্নোত্তোরের রূপদান ॥ ৮১
আয়াতের মান বিবেচনায় আগ-পিছ করা ॥ ৮১
মুফাস্‌সির আলিমের দু'টো শর্ত ॥ ৮২
আয়াতে উদ্ভূত সন্দেহ দূরীকরণের বিদ্যা ॥ ৮৩
শানে নুযূল ও সংশয় নিরসন সম্পর্কিত উপসংহার ॥ ৮৬
ইবনে ইসহাক, ওয়াকিদী ও কালবী (র.)-এর অতিরঞ্জন ॥ ৮৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
উহ্য রাখা ॥ ৮৭
আরো কিছু উহ্য থাকার ধরন ॥ ৯৩
إِذْ শব্দের ব্যবহার ॥ ৯৫
أَنْ এর শুরুতে যের দানকারী অব্যয় উহ্য থাকা ॥ ৯৫
لَوْ দ্বারা শর্তযুক্ত বাক্যে শর্তোত্তর অংশ উহ্য রাখা ॥ ৯৬
'ইবদাল' বা এক শব্দের স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার ॥ ৯৬
এক বিশেষ্যের পরিবর্তে অন্য বিশেষ্য ॥ ৯৮
এক অব্যয়কে অন্য অব্যয় দ্বারা পরিবর্তন করা ॥ ১০২
এক বাক্যের বদলে অন্য বাক্য ব্যবহার করা ॥ ১০৪
অনির্ধারিত বিশেষ্যকে নির্ধারিত বিশেষ্য দ্বারা পরিবর্তন করা ॥ ১০৬
লিঙ্গ ও বচনে বিপরীতটি দ্বারা পরিবর্তন করা ॥ ১০৬
দ্বিবচনকে একবচন দ্বারা পরিবর্তন করা ॥ ১০৭
শর্ত, শর্তের ফলাফল এবং কসম পরবর্তী বাক্যাংশকে স্বতন্ত্র বাক্যে পরিবর্তন করা ॥ ১০৮
সম্বোধনসূচক শব্দের স্থলে অনুপস্থিতসূচক শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা ॥ ১১০
'খবর'সূচক বাক্যাংশকে 'ইন্‌শা'সূচক বাক্য দ্বারা পরিবর্তন করা ॥ ১১১
বাক্যে আগ-পিছ করা ॥ ১১২
শব্দগুলোর দূর সম্পর্ক ॥ ১১২

www.pathagar.com

অতিরিক্ত শব্দ বা বাক্য ব্যবহার ॥ ১১৫
যের প্রদানকারী অব্যয় বৃদ্ধি করা ॥ ১২০
একই শব্দের একাধিক অর্থ প্রকাশ করা ॥ ১২৩
جَعَلَ ও شَيْءٌ শব্দাবলী বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়া ॥ ১২৪
আয়াত বিক্ষিপ্ত হওয়া ॥ ১২৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুহকাম, মুতাশাবিহ, কিনায়া, তা'রীয, মাজাযে আক্‌লীর আয়াতসমূহ ॥ ১২৬
মুতাশাবিহ ॥ ১২৭
'কিনায়া' বা ইঙ্গিত ॥ ১২৮
কাঙ্ক্ষিত অর্থকে উপমার আকারে চিত্রায়ণ ॥ ১২৯
আরবী পরিভাষায় এর উদাহরণ ॥ ১৩০
তা'রীয বা পরোক্ষ ইঙ্গিত ॥ ১৩১
যুক্তিভিত্তিক রূপক ॥ ১৩২

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন মাজীদের শব্দ বিন্যাসের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং মনরঞ্জনকারী আশ্চর্য বর্ণনারীতি ॥ ১৩৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনের বাক্য বিন্যাস ও সূরাগুলোর বর্ণনারীতি ॥ ১৩৩
সূরাসমূহের বিন্যাস ॥ ১৩৩
হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলে কুরআন মাজীদ ॥ ১৩৪
শাহী ফরমানের মত সূরাগুলোর শুরু-শেষ ॥ ১৩৪
কবিতার মত কিছু সূরার সূচনা ॥ ১৩৬
শাহী ফরমানের মত সূরা শেষ করা ॥ ১৩৬
সূরার মাঝখানে বাগ্মিতাপূর্ণ কথা ॥ ১৩৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আয়াত ও পংক্তির মধ্যে পার্থক্য ॥ ১৩৭
আয়াত ও পংক্তির পারস্পরিক মিল ॥ ১৩৮
ছন্দময় বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে মোটামুটি সামঞ্জস্যকেই পারস্পরিক মিল বলার জন্য যথেষ্ট ॥ ১৩৯

www.pathagar.com

আল কুরআনের বর্ণনারীতিতে চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্বারোপ ॥ ১৪১
শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যতায় আয়াতের ছন্দরীতি ॥ ১৪২
মদের হরফে শ্বাস শেষ হওয়াই আয়াতের শেষাংশের মিল ॥ ১৪২
শব্দের শেষে আলিফ যুক্ত হওয়াও একটি ছন্দ মিল ॥ ১৪৩
একই হরফ এবং একই বাক্য বারবার উল্লেখ করা ॥ ১৪৩
সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো আর শেষ আয়াতগুলোর পার্থক্য ॥ ১৪৩
বিরতির জায়গায় আল কুরআনের রীতি ॥ ১৪৪
ছোট আয়াতের সাথে লম্বা আয়াত এবং লম্বা আয়াতের সাথে ছোট আয়াত ॥ ১৪৫
তিন যতি বিশিষ্ট আয়াত ॥ ১৪৬
দুই যতি বিশিষ্ট আয়াত ॥ ১৪৬
ছোট খাট আয়াতের সাথে লম্বাতম আয়াত ॥ ১৪৭
স্বর ও ছন্দবিহীন কিছু সূরা ॥ ১৪৭
নতুন স্বর ও ছন্দরীতি অবলম্বনের কারণ ॥ ১৪৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চইল্‌ম বারবার এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে বর্ণনা করার কারণ ॥ ১৪৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল কুরআন মু'জিযা হওয়ার দিকসমূহ ॥ ১৫১

চতুর্থ অধ্যায়

তাফসীরের রীতিনীতি এবং সাহাবা-তাবিঈগণের এ সম্পর্কিত মতবিরোধের ব্যাখ্যা ॥ ১৫৪
মুফাস্‌সিরগণের শ্রেণী ॥ ১৫৪
সমন্বিত তাফসীর গ্রন্থ ॥ ১৫৫
তাফসীর শাস্ত্রে আমার প্রতি আল্লাহর দান ॥ ১৫৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহাদ্দিস আলিমগণের তাফসীরে বর্ণিত হাদীস এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় ॥ ১৫৬
শানে নুযূল ॥ ১৫৬
সাহাবায়ে কিরামের ধারা ॥ ১৫৭

www.pathagar.com

আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে ষড়যন্ত্রমূলক ইহুদী বর্ণনার অনুপ্রবেশ ॥ ১৫৯
কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর ॥ ১৬০
আল কুরআনের দুর্বোধ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যায় পূর্বসূরি ওলামায়ে কিরামের মতবিরোধের কারণ ও তার প্রতিকার ॥ ১৬২
দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যায় আমার গবেষণা ॥ ১৬৩
রহিতকরণের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামার মতভেদ ॥ ১৬৪
মুহাদ্দিস মুফাস্‌সিরগণের বর্ণিত আরো কিছু বিষয় ॥ ১৬৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ॥ ১৬৬
বিধি-বিধান আহরণ ॥ ১৬৬
তাওজীহ ॥ ১৬৭
উত্তম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধারা ॥ ১৬৭
আকীদাহ বিশেষজ্ঞ ওলামাগণের বাড়াবাড়ি ॥ ১৬৯
কুরআনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ॥ ১৬৯
কুরআনের অর্থ ঠিক করা ॥ ১৬৯
কুরআনের ব্যাকরণ ॥ ১৬৯
অলংকার শাস্ত্র ॥ ১৭০
সুফিয়ায়ে কিরামের ইশারা-ইঙ্গিত ॥ ১৭০
এ'তেবার দলীল হওয়ার প্রমাণ ॥ ১৭১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল কুরআনের দুর্লভ আয়াতসমূহ ॥ ১৭২
কুরআনের পেট ও পিঠ ॥ ১৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইল্‌মে লাদুনী বা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ॥ ১৭৫

www.pathagar.com

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলার এ দুর্বল বান্দার প্রতি তাঁর অসংখ্য-অগণিত অনুগ্রহ-অনুকম্পা রয়েছে। তন্মধ্যে মহত্তম অনুগ্রহ হলো : মহাগ্রন্থ কুরআন বুঝার সৌভাগ্য দান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও অনেক অবদান রয়েছে এ নরাধমের প্রতি। তন্মধ্যে বৃহত্তম অবদান হলো : সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সৃষ্টিকারী মর্যাদাময় মহাগ্রন্থ কুরআন প্রসারের ব্যবস্থা।

প্রথমে স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম প্রজন্মকে কুরআন শিখিয়েছেন, প্রথম প্রজন্ম আবার দ্বিতীয় প্রজন্মকে শিখিয়েছে, এভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় দাওয়াত ও তাবলীগের ধারা অব্যাহত থাকে। এমনকি স্ব-প্রমাণিত রাসূলের শিক্ষা এ দুর্বল বান্দা পর্যন্ত এসে পৌঁছে যায়।

হে আল্লাহ! তোমার শ্রেষ্ঠতম রহমত ও উত্তম বরকতসমূহ আমাদের মহান দিশারী, শাফায়াতকারী মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি বর্ষণ করো। আর তাঁর পরিবারবর্গ সাহাবায়ে কিরাম এবং উম্মতের আলিমদের প্রতিও রহমত বর্ষণ করো। হে অসীম করুণাময়! তোমার নিজ দয়া গুণে তা করো।[১]

আল ফাওযুল কাবীর কী এবং কেন?

আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ (আল কুরআন) বুঝার দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন, তখন আমি কুরআন বুঝতে আগ্রহীদের কুরআন বুঝার পথ সুগম করার লক্ষ্যে কতক জরুরি মূলনীতি সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়নের সংকল্প করলাম। আর আল্লাহ তা'আলার অপার করুণার প্রতি আমি আশাবাদী যে, এ কতক মূলনীতিগুলো বুঝে নিলেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনের জ্ঞান

---

১. প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহর নাম নেয়া, তাঁর প্রশংসা করা ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ করা সুন্নাত। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

"كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِبِسْمِ (وفى رواية) بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ (وفى رواية) فَهُوَ اَبْتَرُ."

অর্থাৎ– "প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার শুরুতে আল্লাহর নাম (কোনো বর্ণনায় এসেছে) তার প্রশংসা করা হয়নি সেটা অসম্পূর্ণ ও বরকতহীন থেকে যায়।"

এ হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থের শুরুতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেছেন। দরূদ পাঠ করাও একটি উত্তম আমল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

"إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا."

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো।" (সূরা আহযাব-৫৬)

www.pathagar.com

অন্বেষণকারীদের পথ সুগম করে দেবেন। কেউ যদি সারা জীবন তাফসীরের কিতাবাদি এবং তাফসীরকার ওলামাগণের নিকট অধ্যয়নে ব্যয় করে, তবুও এসব মূলনীতি এভাবে সাজানো-গুছানো কোথাও পাবে না। আর এটাতো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কুরআনের জন্য এ ধরনের সময় ব্যয়কারীর সংখ্যা আজ খুবই নগণ্য। আমি গ্রন্থটির নাম রাখলাম :

"اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرُ فِىْ اُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ."

(আল-ফাওযুল কাবীর ফী উসূলিত তাফসীর অর্থ : তাফসীরের মূলনীতিতে সফলতার দিশা)

আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই আমার শক্তির আঁধার। আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি। তিনি আমার জন্য যথেষ্ট আর তিনিই উত্তম কর্মসম্পাদনকারী।

গ্রন্থের আলোচ্য সূচি

গ্রন্থখানার বিষয়বস্তু পাঁচটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ।

প্রথম অধ্যায় : পঞ্চজ্ঞানের বর্ণনা, যে পাঁচটি জ্ঞানের আলোচনাকে কুরআনের লাইনে লাইনে সাজানো হয়েছে। যেন এসব বর্ণনা করার লক্ষ্যেই কুরআন নাযিল হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : কুরআনের শব্দজগৎ বিশেষ বিন্যাসে মর্মার্থের দুর্বোধ্যতা। এ অধ্যায়ে আজকালকার মানুষের জন্য কি কি কারণে কুরআন বুঝা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় তা চিহ্নিত করে স্পষ্ট ভাষায় সেসব মুশকিলগুলোকে আসান করার পথ বাতলে দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : কুরআনের সাহিত্যগত বিন্যাস পদ্ধতির সূক্ষ্ম দিকসমূহ এবং তার অপূর্ব বর্ণনাশৈলীর যথাসাধ্য ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গে।

চতুর্থ অধ্যায় : তাফসীরের পদ্ধতি এবং তাফসীর সংক্রান্ত ঐসব মতবিরোধ যা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, তার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে।

পঞ্চম অধ্যায় : কুরআনের দুর্বোধ্য শব্দভাণ্ডারের ব্যাখ্যা ও ঐসব শানে নুযূলের (আয়াতের পটভূমি) আলোচনা, যা মুফাস্‌সির মাত্রেরই জানা থাকা আবশ্যক। আর যা জানা না থাকলে কারো জন্য আল্লাহর কিতাবের তাফসীর বিষয়ে গবেষণা করা বৈধ নয়।

দরূদ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পাঠ করলে অতি অবশ্যই তা কবুল করা হয়। অন্য কোনো আমলের সাথে দরূদ পাঠ করা হলে দরূদের ওসীলায় আশা করা যায় সে আমলও মাকবুল হবে। এজন্যই ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, দোয়ার শুরু ও শেষে দরূদ পাঠ করা হলে সে দোয়া কবুল করা হয়। গ্রন্থকার আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি দরূদ প্রেরণ করেছেন। যেন আল্লাহ তা'আলা এ গ্রন্থটিকে কবুল করেন।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের পঞ্চজ্ঞান

কুরআনে কারীমের সুনির্ধারিত ভাবার্থ বিষয় হিসেবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত :

১. 'ইলমুল আহকাম' (বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান)। আর তা হলো : ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, জায়িয, মাক্‌রূহ এবং হারামের জ্ঞান। চাই তা ইবাদত সংক্রান্ত হোক বা আচার, ব্যবহার ও লেনদেন সংক্রান্ত হোক অথবা পারিবারিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত হোক বা রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত হোক। এ জ্ঞানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়ার দায়িত্ব ফিকাহ তত্ত্ববিদ আলিমগণের উপর অর্পিত।

২. 'ইলমুল জাদল' (তর্কবিদ্যা)। ইহুদী, খ্রিস্টান, মুশরিক ও মুনাফিক– এ চারটি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে প্রামাণিক বিতর্কের জ্ঞান। এ জ্ঞানের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার দায়িত্ব مُتَكَلِّم বা ধর্মতত্ত্ববিদ আলিমগণের উপর ন্যস্ত।

৩. ইলমুত্ তাযকীর বি-আ-লা-ইল্লাহ বা সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞান। এতে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য, মানুষকে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দান ও আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ গুণরাজির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৪. 'ইলমুত্ তাযকীর বি-আয়্যামিল্লাহ' বা ইতিহাস শাস্ত্র। এতে অনুগত বান্দাদেরকে শান্তি প্রদান সম্পর্কিত যেসব ঘটনা অতীতে সংঘটিত হয়েছে, তা বর্ণিত হয়েছে। (যেন এ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়)।

৫. 'ইলমুত্ তাযকীর বিল মাওত ওয়ামা বা'দাহু' বা মৃত্যু ও পরকাল জ্ঞান। মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান, হাশরের ময়দান সংঘটিত হওয়া, পাল্লায় পাপ-পুণ্যের পরিমাপ, কৃতকর্মের হিসাব প্রদান এবং প্রতিদানস্বরূপ জান্নাত-জাহান্নাম লাভ করার বর্ণনা এখানে চিত্রিত হয়েছে।

শেষোক্ত তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আনুষঙ্গিক হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের বাণী আলোচনা করার দায়িত্ব বর্তায় সতর্ককারী ওয়ায়েয উলামায়ে কিরামের প্রতি।

পঞ্চইল্‌ম উপস্থাপনায় কুরআনে কারীমের বর্ণনাশৈলী

কুরআনের এসব জ্ঞান তৎকালীন আরবদের সাহিত্যরীতিতে বর্ণিত হয়েছে, পরবর্তী উলামায়ে কিরামের অনুসৃত রীতিতে নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াতের ক্ষেত্রে পরবর্তী আইনবিদ গ্রন্থকারদের মতো

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনারীতিকে আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করেননি। ঠিক তেমনি মূলনীতি বিশেষজ্ঞ আলিমদের ন্যায় অপ্রয়োজনীয় চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বক্তব্যকে সাজাননি। তার্কিক আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা সর্বজন স্বীকৃত যুক্তি-প্রমাণ ও কল্যাণকর সহজ-সরল উপস্থাপনার রীতি অবলম্বন করেছেন। তর্কবিদদের মতো যুক্তির ধারাবাহিকতার দীর্ঘ সূত্রতার অবতারণা করেননি।

আল্লাহ তা'আলা তার কালামে পাকে এক বিষয়বস্তু থেকে অন্য বিষয়বস্তুর দিকে ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তী লেখক-সাহিত্যিকদের মতো বিশেষ কোনো যোগসূত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। বরং বান্দাদের জন্য যখন যা প্রয়োজনীয় মনে করেছেন, আগে-পরের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে তখন তা-ই বলে দিয়েছেন।

শানে নুযূল

সাধারণ মুফাস্‌সিরগণ বিধি-বিধান সম্বলিত ও তার্কিক আয়াতসমূহকে একেকটি ঘটনার সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আর তাঁরা ঐ ঘটনাকেই সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের শানে নুযূল বা অবতরণের একমাত্র কারণ বলে মত পোষণ করেন। অথচ কুরআন অবতরণের মূল লক্ষ্যই হলো, মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধন। ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানা এবং কুসংস্কার ও অসৎ কাজ-কর্ম থেকে মানুষকে বাঁচানো। তাই কুরআনের বিভিন্ন ধরনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন কারণ নিহিত রয়েছে।

আল্লাহর বিধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত বান্দাদের (মানব-দানব) মনে পুঞ্জিভূত ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই তার্কিক আয়াতসমূহ (ايات الجدل) অবতীর্ণ হয়েছে। কুসংস্কার ও কু-কর্ম ও সমাজে জুলুম-অত্যাচার বিদ্যমান থাকার কারণে বিধি-বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি, তাঁর সুনিপুণ সৃষ্টি রহস্য, পূর্ববর্তী জাতির পুরস্কার পরিণামের ইতিহাস, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী জগতের ব্যাপারে অসচেতনতা ও উদাসীনতার কারণেই উপদেশমূলক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

আসলে তাফসীরকারগণ শানে নুযূল হিসেবে যেসব বিশেষ কারণ ও ঘটনাবলীর অবতারণা করেছেন, তাফসীরের ক্ষেত্রে এসবের উল্লেখযোগ্য কোনো কার্যকারিতা নেই। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু আয়াতে আবার সেসবের গুরুত্ব রয়েছে। যেসব আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের বা তাঁর আগের কোনো ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আর ঐ ইঙ্গিতের ফলে শ্রোতার মনে জানার যে ভাব তৈরী হয়, বিস্তারিত বিবরণ ছাড়া সে চাহিদা পূরণ হয় না। সুতরাং আলোচ্য পঞ্চজ্ঞান এমন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা উচিত, যেন খুঁটিনাটি ব্যাপার ও ঘটনাবলী বর্ণনার প্রয়োজন দেখা না দেয়।

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

তর্কবিদ্যা

পবিত্র কুরআনে চারটি পথভ্রষ্ট দলের সাথে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। চারটি দল হলো– মুশরিক, ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুনাফিক। আর এই বিতর্ক দুইভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রথমতঃ তাদের ভ্রান্ত আকীদাহ-বিশ্বাস উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে জঘন্য বলে শুধু ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ তাদের কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন ধারণাগুলো উপস্থাপন করে সর্বজন মান্য দলিল-প্রমাণ ও উপমা-উপদেশের মাধ্যমে সেগুলোর অসারতা বর্ণনা করা হয়েছে।

মুশরিকদের আলোচনা

মুশরিকরা নিজেদেরকে 'হানীফ' নামে অভিহিত করত এবং তারা ইব্রাহীম (আ)-এর ধর্মের অনুসারী বলে দাবি করত। আর তাকেই 'হানীফ' বলা হয় যে, ইব্রাহীম (আ)-এর ধর্মের অনুসরণ করে এবং সে ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ মেনে চলে।

ইব্রাহীমী ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. কা'বা শরীফের হজ্জ সম্পাদন করা।

২. কা'বামুখী হয়ে নামায পড়া।

৩. স্ত্রী সহবাস বা স্বপ্নদোষে গোসল করা।

৪. খত্না করা।

৫. (সুনির্ধারিত নিয়মে) স্বভাবজাত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।[১]

৬. মর্যাদাবান মাসগুলোকে মর্যাদা দেয়া (যিলক'দা, যিলহিজ্জাহ্, মুহর্‌রম ও রজব)

৭. মাসজিদুল হারামকে সম্মান প্রদর্শন করা।

৮. বংশগত ও দুগ্ধ সম্পর্কিত যেসব মহিলাদের সাথে বিবাহ হারাম তাকে হারাম স্বীকৃতি দেয়া।

---

১. স্বভাবজাত কার্যাবলীর মধ্যে : গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের জোড়াসমূহ ধৌত করা, বগলের লোম উপড়ানো, নাভীর নিচের লোম কাটা, প্রস্রাব-পায়খানার সময় ঢিলা ব্যবহার করা ও শৌচকার্য সম্পাদন করা, বর্ণনাকারী রাবী বলছেন : দশমটি আমি ভুলে গেছি, তবে সম্ভবত তা হবে গড়গড়া করে কুলি করা। (মুসলিম শরীফ, হাদীস-৩৭৯)

www.pathagar.com

৯. গলাকে জবাইয়ের ক্ষেত্র মনে করা এবং নহরের ক্ষেত্র বুকের উপরিভাগকে মনে করা।

১০. জবাই ও নহরের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা, বিশেষত হজ্জের দিনগুলোতে।

ইব্রাহীমী ধর্মের বিধি-বিধান

আসলে দ্বীনে ইব্রাহীমীতে ওযু, নামায, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখা, এতিম-মিসকিনদেরকে দান-খয়রাত করা, সত্যের পথে সাহায্য করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার বিধান ছিলো। এসব পালন করাকে তারা গৌরবজনক ও প্রশংসনীয় বলে ভাবত।

কিন্তু মুশরিকরা এগুলোকে এমনভাবে ছেড়ে দিয়েছিল এবং অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তাদের বাস্তব জীবন দেখে মনে হতো, এসব বিধি-বিধান কোনো দিনই তাদের ধর্মে ছিলো না।

তেমনি হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, সুদ এবং ডাকাতির অবৈধতাও তাদের মূল বিধানে যুক্ত ছিলো। সমষ্টিগতভাবে এসব কাজের প্রতি তাদের ঘৃণাও অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু অধিকাংশ মুশরিকরা এসব অন্যায় করত এবং এসব ব্যাপারে তারা তাদের কু-প্রবৃত্তির গোলামি করত।

ইব্রাহীমী ধর্মের আকীদাহ ও বিশ্বাস

ইব্রাহীমী ধর্মে সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিলো। বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, তিনি সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, বড় বড় ঘটনাবলীর ব্যবস্থাপক, তিনি রাসূল প্রেরণ এবং বান্দাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দান করেন। তিনিই বড় বড় ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পরিকল্পনাকারী, ফেরেশতারা তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্দা আর তাঁরা সম্মানের পাত্র– এসবই তাঁদের (ইব্রাহীমী ধর্মাবলম্বীদের) আকীদাহ-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাদের কবিদের কবিতাগুলো এর প্রমাণ বহন করে। কিন্তু অধিকাংশ মুশরিকরা এসব বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সন্দেহের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ল, এর কারণ হলো, তারা এসব আকীদাহ-বিশ্বাসকে অসম্ভব মনে করত এবং ঐগুলো অনুধাবন করার প্রতি নিস্পৃহ হয়ে পড়েছিল।

মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস

মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলোর মধ্যে ছিলো :

১. 'শিরক' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

www.pathagar.com

২. 'তাশবীহ' অর্থাৎ আল্লাহকে বান্দার সাথে তুলনা করা।

৩. 'তাহরীফ' অর্থাৎ ধর্মকে বিকৃত করা।

৪. পরকাল অস্বীকার করা।

৫. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অসম্ভব মনে করা।

৬. সমাজে জুলুম-অত্যাচার ও অসৎ কাজকর্মের বিস্তার।

৭. কুসংস্কার উদ্ভাবন।

৮. ইবাদত-বন্দেগীর বিলোপ ঘটা ইত্যাদি।

শিরক

যেসব গুণাবলী একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেসব গুণে গুণান্বিত করাকে 'শিরক' বলে। যেমন, ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের সার্বিক ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দেয়া। যাকে কুরআনের ভাষায় كُنْ فَيَكُوْنُ (হও, অতঃপর তা হয়ে যায়) দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

অথবা 'স্বয়ং সম্পন্ন জ্ঞান' যা ইন্দ্রিয় শক্তি, বুদ্ধি-বিবেচনা, স্বপ্ন এবং ইলহামের (অতীন্দ্রিয়র মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান) মতো অন্য মাধ্যমে অর্জিত নয়। অথবা রোগীদেরকে উপশম দান, কারো প্রতি অভিশাপ করা বা কারো প্রতি রাগান্বিত হওয়া যার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবিকা সংকুচিত হয়ে যায় বা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে বা সে ঐ রাগের ফলশ্রুতিতে দুর্ভাগ্যবান হয়ে যায়। আর কারো প্রতি দয়াবান হওয়ায় তার জীবিকা প্রশস্ত হয়ে যাওয়া, স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্যবান হয়ে যাওয়া, (এসবই আল্লাহর বিশেষ গুণ)।

অথচ এসব মুশরিকরাই মৌলিক সৃষ্টিরাজির ব্যাপারে এবং বড় বড় কাজসমূহ পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক ভাবত না। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ যখন যা করতে চান, তাতে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারোর নেই।

তাদের শিরকটা ছিলো বিশেষ ব্যাপারে বিশেষ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে। যেমন কোনো বড় বাদশাহ তার একান্ত লোকদেরকে তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার শাসনভার দিয়ে প্রেরণ করে, বিশেষ কোনো বাদশাহী ফরমান জারি হওয়ার আগ পর্যন্ত ছোট-খাট বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হয়। প্রজাদের ছোট-খাট বিষয়ে তিনি কোনো হস্তক্ষেপ করেন না। বরং প্রজাদেরকে শাসনকর্তাদের হাতে ন্যস্ত করেন। যেসব প্রজা-সাধারণ শাসনকর্তাদের সেবা করে এবং তাদেরকে মাধ্যম ধরে (বাদশাহ থেকে কোনো কার্য সিদ্ধির জন্য) ঐসব প্রজাদের ব্যাপারে

www.pathagar.com

বাদশাহ শাসনকর্তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন। ঠিক তেমনি মহান রাজাধিরাজ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোনো কোনো বান্দাদেরকে প্রভুত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেন। আর তাদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি অন্যান্য বান্দাদের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে এমন করে দিয়েছেন। ফলে সাধারণ মানুষ ঐসব নৈকট্যপ্রাপ্ত প্রভুরূপী মানুষদের নৈকট্য অর্জন করাকে জরুরি মনে করে, যেন আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করা তাদের জন্য সহজ হয়। আর ছোট-খাট ব্যাপারে তাদের পক্ষে ঐসব প্রভুরূপী মানুষদের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

এসব কারণে তারা ঐসব প্রভুরূপী মানুষদের সামনে সিজদা করা, তাদের নামে কুরবানী করা, তাদের নাম নিয়ে শপথ করা, গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সাহায্য প্রার্থনা করাকে বৈধ মনে করত। পাথর ও পিতল দিয়ে তাদের আকৃতিতে ভাস্কর্য তৈরী করত। এসব ভাস্কর্য বা মূর্তিকে তাদের আত্মার প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য কিবলা বানাত। এভাবে সময়ের ঘূর্ণিপাকে এক সময় ঐসব মূর্খেরা পাথর ও পিতলের তৈরী এসব মূর্তিকে প্রকৃত উপাস্য (মা'বুদ)রূপে বিশ্বাস করে ফেলে। আর এ থেকেই আকীদাহ-বিশ্বাসের অঙ্গনে বিরাট ফেতনার অনুপ্রবেশ ঘটে।

তুলনা দেয়ার ধারণা

'তাশবীহ' অর্থ হচ্ছে মানুষের মানবিক গুণাবলীকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সংযুক্ত করা। তারা বলত, ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার কন্যা। তারা এ-ও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ তা'আলা নিজে পছন্দ না করলেও কখনো বিশেষ বান্দাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন। যেমন কখনো বাদশাহরা তাদের বড় বড় গভর্নরদের ব্যাপারে এমন করে থাকেন। যখন আল্লাহ তা'আলার মর্যাদাপোযোগী অসীম জ্ঞান, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তির গুণকে বুঝতে অক্ষম হলো, তখন আল্লাহ তা'আলার এসব গুণাবলী নিজেদের সসীম ক্ষমতা ও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অনুরূপ ভাবতে লাগল। এভাবে তারা নিরাকার আল্লাহর জন্য আকার ও দেহ সাব্যস্ত করে, আর এ-ও বিশ্বাস করে বসে যে, ঐ দেহের অবস্থানের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানও আছে।

ধর্ম বিকৃতি

মুশরিকদের ধর্ম বিকৃতির ইতিহাস হলো, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরগণ 'আমর ইবনে লুহাই নামক অভিশপ্ত শয়তানের যুগ পর্যন্ত তাদের মহান পূর্ব পুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ধর্মে অটল ছিলো। এ ব্যক্তি তাদের জন্য (হুবল নামক) মূর্তি এনে স্থাপন করল। এর ইবাদত করাকে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

www.pathagar.com

সে তাদের জন্য 'বাহীরা'[১], 'সায়েবা'[২] 'হামী'[৩] মুক্ত করা এবং তীরের মাধ্যমে লটারি প্রথা চালু করে। পাপিষ্ঠ 'আমর ইবনে লুহাইয়ের এ অপকর্ম সংঘটিত হয়েছিল শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের প্রায় তিনশ বছর পূর্বে। মুশরিকরা এসব কাজের বৈধতার পক্ষে তাদের বাপ-দাদাদের কৃতকর্মকে প্রমাণরূপে পেশ করত এবং এটাকে অকাট্য দলিল বলে বিশ্বাস করত।

পরকাল অস্বীকার

পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামও পুনরুত্থান ও হাশর সম্পর্কে লোকদেরকে বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু পবিত্র কুরআনে যত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে তত বিস্তারিত তাঁরা বলেননি। ফলে মুশরিকরা এ সম্পর্কে অল্প জ্ঞানই রাখত। তাই তারা পরকাল সংঘটিত হওয়াকে সুদূর পরাহত ভাবত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অসম্ভব মনে করা

এই মুশরিক দল যদিও হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ), এমনকি হযরত মূসার (আ) নবুওয়াতকে স্বীকার করত, কিন্তু তারপরও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের ব্যাপারে দু'টো কারণ তাদেরকে সন্দেহে ফেলে দিত।

প্রথমটি হলো– নবী-রাসূলদের মানবীয় গুণাবলী, যা তাঁদের পূর্ণতা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়। দ্বিতীয়টি হলো, নবুওত ও রিসালতের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য 'মানুষ' নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে না জানার দরুন তারা একই সত্তার মধ্যে নবুওয়াত ও মনুষ্যত্ব একত্রিত হওয়াকে অসম্ভব ভাবত। তারা মনে করত 'দূত' দূত প্রেরকের অনুরূপ সত্তা হওয়া জরুরি। ফলে আবোল-তাবোল অনেক প্রশ্ন উত্থাপন শুরু করে দিল। যেমন : তারা বলত, নবীর আবার খাওয়া-দাওয়ার দরকার হবে কেন? (সূরা ফুরকান : ৭) আল্লাহ তা'আলা কেন ফেরেশতাকে নবী করে পাঠালেন না? (মু'মিনুন : ২৪) মানুষের কাছেই যদি তিনি ওহী পাঠাবেন তবে আলাদা-আলাদাভাবে প্রত্যেকের কাছে কেন পাঠালেন না? (আন'আম : ১২৪) এ ধরনের আরো কতো প্রশ্ন! (বনী ইসরাঈল : ৯০-৯৩)

---

১. ঐ পশু যার দুধ মুশরিকরা মূর্তিদের নামে উৎসর্গ করত। ২. যে পশু মূর্তিদের মাঝে ছেড়ে দেয়া হতো। ৩. 'হামী' এমন নর উট যা নির্ধারিত সংখ্যায় সংগম করেছে। একেও তারা দেবতাদের নামে ছেড়ে দিত।

www.pathagar.com

মুশরিক দল যুগে যুগে

যদি সে যুগের মুশরিকদের আকীদাহ ও আমল সম্পর্কিত অবস্থা জানতে কষ্ট হয়, তবে আজকালকার ধর্ম বিকৃতকারীদের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, বিশেষতঃ যারা মুসলিম ভূখণ্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। অনেক দিক থেকে উভয় দলের মধ্যে মিল রয়েছে, উদাহরণত :

১. তৎকালীন মুশরিকরা নবুওয়াতকে মৌলিকভাবে বিশ্বাস করলেও তাদের যুগের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অসম্ভব মনে করত যেমন আজকালকার অনেক মূর্খ লোক আগেকার ওলিগণের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাদের যুগের ওলীদের ব্যাপারে অসম্ভব বিষয় মনে করে।

২. আরবের মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মৃত্যুর পর তাদের ভাস্কর্য তৈরী করে সেগুলোর সিজদা করত, তাদের নামে শপথ করত ও কুরবানী করত, বিপদাপদে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করত। তেমনি এ যুগের নব্য মুশরিকরা মৃত ওলি-আওলিয়াগণকে অনেক কাজে ক্ষমতাবান বিশ্বাস করে। তাদের মাজারে গিয়ে নানা ধরনের শিরকি কাজ-কর্ম সম্পাদন করে।

৩. তৎকালীন মুশরিকরা আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করত। আল্লাহর জন্য মানবিক গুণাবলী সাব্যস্ত করত। ঠিক তেমনি এ যুগের নব্য মুশরিকরা আল্লাহ ও বাদশাহদের মধ্যবর্তী তুলনা উপস্থাপন করে আল্লাহ ও ওলি-আওলিয়াদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করে। ছোট-খাট কাজ ওলিগণের হাতে ন্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা নিজে বড় বড় কাজ সম্পাদন করেন।

৪. তৎকালীন মুশরিকরা মূর্তিপূজা করে ধর্ম বিকৃতি করত। তেমনি আজকালকার মুসলমান নামধারী মুশরিকরা কবর পূজা করে শিরকি কাজে লিপ্ত রয়েছে।

একটি হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ

অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ ও তরীকা অনুসরণ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীসের নিরিখে আমরা দেখছি যে, আমাদের যুগের কোনো কোনো দল এসব ভিত্তিহীন আকীদাহ-বিশ্বাস ও অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব বানোয়াট বিশ্বাস ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করুন।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা নিতান্ত দয়ায় নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরবদের মাঝে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে

www.pathagar.com

ইব্রাহীমী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে মুশরিকদের সাথে বিতর্কের অবতারণা করলেন। আর প্রমাণস্বরূপ ঐসব ইব্রাহীমী মতাদর্শগত যুক্তিতর্কই তুলে ধরলেন যা তাদের নিজেদের কাছেই স্বীকৃত। (সূরা রুম : ২৭, সূরা মু'মিন : ৫৭) যেন তাদের নিজেদের কাছেই নিজেদের অভিযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং যেন কোনোভাবেই তারা তা অস্বীকার করতে না পারে।

শিরকের জবাব

পবিত্র কুরআনে মুশরিকদের শিরকের জবাব চারটি ধারায় দেয়া হয়েছে :

১. ক. কুরআনে কারীম মুশরিকদের কাছে তাদের ভ্রান্ত ধারণার প্রমাণ পেশ করতে দাবি উপস্থাপন করেছে। (সূরা কাহাফ : ৪, নমল : ৬৪, আনআম : ১৪৮, আম্বিয়া : ২৪) অথচ তাদের নিকটতম পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ ছাড়া তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই।

খ. তারা তাদের পূর্বসূরিদের যে অন্ধ অনুসরণ আঁকড়ে ধরে আছে, কুরআন তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খণ্ডন করেছে।

২. তারা যেসব বান্দাদেরকে আল্লাহর মতো ক্ষমতাবান মনে করত, এ দু'য়ের মাঝে যে কোনো তুলনা চলে না কুরআন তা স্পষ্ট ভাষায় প্রমাণিত করেছে। সাথে সাথে চরম মর্যাদা লাভের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তা'আলাকেই সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে এ মর্যাদার যোগ্য এরা নয়।

৩. কুরআন তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় এবং শিরকের অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের (আ) ঐক্যমত্য উপস্থাপন করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

"অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্ববর্তী কোনো নবীকেই এ ওহী ছাড়া প্রেরণ করিনি যে, আমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, সুতরাং একমাত্র আমারই ইবাদত করো।" (আম্বিয়া : ২৫)

৪. মূর্তিপূজা যে জঘন্য এক বোকামি তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পাথর একটি জড় সৃষ্টি যেখানে মানুষের মর্যাদারই ধারে কাছে যেতে পারে না, সেখানে ঐ পাথর কীভাবে আল্লাহ হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারে! এ জবাবটি তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা একমাত্র মূর্তিদেরকেই মূল উপাস্য মনে করত। (এরা তাদের জন্য প্রযোজ্য) নয় যারা মূর্তি মাধ্যম মনে করে আল্লাহর ইবাদত করত।)

www.pathagar.com

কুরআনে কারীম তিনটি ধারায় 'তাশবীহ' অর্থাৎ আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করার জবাব দিয়েছে :

১. তাদের থেকে তাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। আর তারা এ ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব পুরুষদের অনুসরণকে যে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করত, তা খণ্ডন করা হয়েছে।

২. পিতা-পুত্রের মধ্যে শ্রেণীগত সমতা জরুরি। আর তাদের বিশ্বাসানুযায়ী 'ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা'। এক্ষেত্রে ঐ সমশ্রেণিতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

৩. কুরআন এটাও জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা যে জিনিসকে নিজেদের জন্য ভাল মনে করে না তা কিভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে! যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

أَلِرَبِّكَ الْبَنٰتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালকের জন্যই কি রয়েছে কন্যা সন্তান আর তাদের জন্য পুত্র সন্তান?" (সফ্ফাত-১৪৯)

এ তৃতীয় জবাবটি তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা প্রসিদ্ধ কাল্পনিক ধারণায় বিশ্বাসী ছিলো। আর অধিকাংশ মুশরিকদের অবস্থা এমনই ছিলো।

ধর্ম বিকৃতির জবাব

আল কুরআনে মুশরিকদের ধর্ম বিকৃতির জবাব দেয়া হয়েছে এভাবে :

১. শিরকের কোনো মূল নেই। এটা ভ্রান্ত ধারণারই ফসল। এটা ইব্রাহীমী ধর্মের মহান ব্যক্তিদের থেকে বর্ণিত নয়। (আন'আম : ১৪৮)

২. এসব মনগড়া বিশ্বাস এমন লোকদের সৃষ্টি যারা পাপিষ্ঠ। (আন'আম : ১৪০)

পরকাল অস্বীকারের জবাব

যারা পুনরুত্থানকে অসম্ভব ভাবত কুরআনে কারীম বিভিন্নভাবে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছে :

১. প্রথমতঃ তুলনামূলক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : জমি শুকিয়ে অনুর্বর হয়ে যাওয়ার পর আবার আমি যেভাবে সে জমি সুজলা-সুফলা করে তুলি অর্থাৎ মৃত পৃথিবীটাকে আবার যে জীবন দান করি সেভাবেই তোমাদের মৃত্যুর পর আবার আমি তোমাদেরকে জীবিত করে তুলব। এমন আরও অনেক উপমা তুলে ধরেছেন। (রূম : ২৭, ইয়াসীন : ৭৯-৮১)

www.pathagar.com

২. পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়ার সংবাদ প্রদান করেছে। (সূরা নাজম : ৩৬, ৩৭, ৪৭)

শেষ নবীর অস্বীকারকারীদের জবাব

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালত অস্বীকারকারীদেরকে কুরআনে কারীম বিভিন্নভাবে জবাব দিয়েছে :

১. নবুওয়াত ও রিসালত নতুন কোনো ঘটনা নয়। এর আগেও অনেককে নবী-রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। আর মুশরিকরা তাঁদেরকে নবীরূপে স্বীকার করত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ـ

অর্থাৎ, "তোমার পূর্বে আমি যাদেরকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছি, তারা সকলে লোকালয়ে বসবাসকারী পুরুষ ছিলেন।" (সূরা ইউসুফ : ১০৯)

অন্যত্র ইরশাদ করেন :

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلاً ـ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ـ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتَابِ ـ

অর্থাৎ, "কাফেররা বলে, আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল নন। (হে নবী) আপনি বলুন : আল্লাহ আর যারা কিতাব সম্পর্কে জ্ঞানী তারা আমার ও তোমাদের ভেতরকার ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।" (সূরা রা'দ : ৪৩)

২. নবুওয়াত ও রিসালতের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তারই দরকার থেকে কাউকে দূত বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। বরং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত কোনো মানুষের কাছে ওহী অবতীর্ণ করেন। এটাই হলো নবুওয়াত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ ـ

অর্থাৎ, "(হে নবী) আপনি বলুন : নিশ্চয় আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ, তবে পার্থক্য হলো, আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়।" (সূরা হা-মীম সাজদা : ৬)

তারপর ওহীর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যা অবাস্তব ও অসম্ভব বলে মনে হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

www.pathagar.com

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ـ

অর্থাৎ, "মানুষের এমন সামর্থ্য নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে ওহী ছাড়া কথা বলবেন বা পর্দার আড়াল ছাড়া বা ফেরেশতা প্রেরণ ছাড়া। যে দূত আল্লাহর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। নিশ্চয় তিনি সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা শূরা : ৫১)

৩. তাদের পক্ষ থেকে মু'জিযা দাবি করা।[১] তাদের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে নবী বানানো।[২] ফেরেশতাদেরকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা[৩] এবং প্রত্যেকের কাছে ওহী প্রেরণ করার দাবি[৪] উত্থাপনের প্রেক্ষিতে কুরআনে কারীম স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাদের এসব দাবি পূরণ করা মোটেও কোনো কঠিন কাজ নয়। তবে তিনি এমনটি করেননি মহৎ এক উদ্দেশ্যে যা বুঝে ওঠা তাদের জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে।[৫]

পুনর্জবাব

আল্লাহ তা'আলা যাদের কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন, তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক। তাই এসব বিষয়ে কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন পন্থায় অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের আলংকারিক ভঙ্গিমায় গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। বারবার বলতে দ্বিধা করেননি। হ্যাঁ, মহান প্রজ্ঞাময় সত্তার উপদেশ এমন নির্বোধ মূর্খদের জন্য এমনই হওয়া উচিত। এটাই মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত রীতি।

ইহুদীরা তাওরাত কিতাবে ঈমান এনেছিল। পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন ভ্রষ্টতার পথ বেছে নেয়। তাদের বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে :

১. তাওরাতের বিধি-নিষেধে শাব্দিক ও আর্থিক বিকৃতি করা। (মায়েদা : ১৩)

২. তাওরাতের আয়াতসমূহ জনসাধারণ থেকে গোপন করা। (বাকারা : ১৫৯)

৩. তাওরাতে নিজেদের পক্ষ থেকে নতুন সংযোজন করে তাওরাত হিসেবে চালিয়ে দেয়া। (সূরা আলে ইমরান : ৭৮)

৪. তাওরাতের বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে অবহেলা প্রদর্শন। (সূরা মায়েদা : ৬৬)

---

১. বনী ইসরাঈল : ৯০-৯৩। ২. যুখরুফ ; ৩১। ৩. মু'মিনুন : ২৪। ৪. আন'আম : ১২৪। ৫. বনী ইসরাঈল : ৫৯।

www.pathagar.com

৫. নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক কঠোরতা।

৬. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অস্বীকার করা, তাঁর সাথে বেয়াদবি ও তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো। এমনকি আল্লাহ তা'আলার সাথেও এ ধরনের আচরণ করা। (সূরা বাকারা : ১০৪)

৭. কৃপণতা, লোভ-লালসা ইত্যাদি দুশ্চরিত্রে জড়িয়ে পড়া। (সূরা আলে ইমরান : ৭৫)

তাওরাত বিকৃতি

দ্বীন লেখকের মতে, তারা তাওরাতের অনুবাদ এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে শাব্দিক বিকৃতি ঘটিয়েছে। মূল তাওরাতে বিকৃতি ঘটায়নি।[১] হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ মতই ব্যক্ত করেছেন। আর আর্থিক বিকৃতি হলো, পথভ্রান্ত হয়ে ও স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্তী হয়ে তাওরাতের আয়াতের অপব্যাখ্যা করা।

অর্থগত বিকৃতির উদাহরণ

১. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ধর্মের পাপী, ধার্মিক ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে দিয়েছেন। কাফিরদেরকে ভীষণ আযাব ও চিরকাল জাহান্নামে দগ্ধ হওয়ার ভয় দেখিয়েছেন। আর পাপী ধার্মিকদের ব্যাপারে নবীদের সুপারিশের মাধ্যমে শাস্তি থেকে মুক্তির পথ খোলা রেখেছেন।

আর এটা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে তাদের ধর্মীয় নাম নিয়ে উল্লেখ করেছেন। তাওরাতে এ মর্যাদা ইহুদী ও হিব্রুদেরকে, ইঞ্জিল কিতাবে খ্রিস্টানদেরকে এবং পবিত্র কুরআনে মুসলমানদেরকে মুক্তি ও জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য মুক্তির মাপকাঠি একই ছিলো। আর তা হলো : আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্ত ঈমান আনা, কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনা আর তাদের প্রতি প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর আনীত বিধি-বিধানের উপর আমল করা। নিষিদ্ধ কাজ-কর্ম থেকে দূরে থাকা। মুক্তি আর শাস্তির হুকুম বিশেষ কোনো ধর্মাবলম্বীদের জন্য নির্ধারিত করা হয়নি।

কিন্তু ইহুদীরা বুঝে নিল জান্নাতের মর্যাদা কেবল ইহুদী ও হিব্রুদের জন্যই নির্ধারিত। তাদেরকেই নবীদের সুপারিশ দ্বারা মুক্তি দেয়া হবে। তাদের মধ্যে পাপীরা শুধু নির্ধারিত কয়েকদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে। যদিও মুক্তির মূল

---

১. আল্লামা রহমতুল্লাহ কিরানভী (রহ) তার 'ইযহারে হক্ব' গ্রন্থে বাইবেল থেকে শতাধিক উদ্ধৃতি উপস্থাপনপূর্বক প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিল শব্দগতভাবেই বিকৃত হয়ে গেছে। যুগে যুগে তাদের ধর্মযাজক, পাদ্রীরা আল্লাহর বাণীর সাথে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো নিজেদের গড়া কথা মিশিয়ে সেটাকেই আল্লাহর বাণী হিসেবে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছে।

www.pathagar.com

মাপকাঠি তাদের ভেতর না পাওয়া যায় অর্থাৎ যদিও আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবীর প্রতি সঠিক অর্থে ঈমান না-ও থাকে। আর এটা নিতান্তই ভুল ও মূর্খতা। কুরআনে কারীম তাদের এ সন্দেহের পর্দা খুলে দিয়েছে পরিপূর্ণভাবে। কারণ কুরআন তো পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের অস্পষ্টতা দূরকারী এবং উদ্ভূত সকল প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব দানকারী একটি তত্ত্বাবধায়ক কিতাব। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব সম্বলিত আল্লাহ তা'আলার বাণী :

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ .

অর্থাৎ, কেন নয়? যারা মন্দ কাজ করে এবং যাদের মন্দ কাজ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে, তারাই জাহান্নামবাসী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। (সূরা বাকারা : ৮১)

২. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী জাতির জন্য তাদের যুগোপযোগী করে বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছেন। এসব বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সে জাতির সৎস্বভাবের লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সেসব বিধি-বিধান আঁকড়ে ধরা, এর উপর আমল চালু রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা, এর উপর বিশ্বাস করা, এ ধর্মের মধ্যেই সত্য সীমাবদ্ধ মনে করা অর্থাৎ এটা বিশ্বাস করা এ যুগে সত্যধর্ম বলতে এটাই– এসব বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে। আর সেসব বিধি-বিধানের উপর আমল চালু রাখার ব্যাপারটি সময়সাপেক্ষ অর্থাৎ পরবর্তী নবী আগমন করার আগ পর্যন্ত। যতদিন না পরবর্তী নবীর নবুওয়াত প্রকাশ না পাবে। কিন্তু ইহুদী আলিমরা এর অর্থকে বিকৃত করে জনসাধারণকে বোঝান যে, ইহুদী ধর্ম কোনো দিন রহিত হবে না। ইহুদী আলিমেরা আরেকটি কথা বলত যে, হযরত ইয়াকুব (আ) ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর সন্তানদেরকে অসিয়ত করে গেছেন যে, তোমরা ইহুদী ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকবে। সুতরাং এ ধর্ম রহিত হবে না। অথচ ইয়াকুব (আ)-এর অসিয়তের অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান ও সৎকর্মসমূহ আঁকড়ে ধরে থাকা। তার অসিয়তের এটা উদ্দেশ্য ছিলো। ইহুদী ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য তিনি অসিয়ত করেননি। অথচ ইহুদী আলিমদের অপব্যাখ্যার দরুন সাধারণ ইহুদীরা বিশ্বাস করে বসল যে, ইয়াকুব (আ) চিরদিন ইহুদী ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা সব ধর্মেই নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীদেরকে নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং প্রিয় বলে ভূষিত করেছেন। আর যারা ধর্মকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে

www.pathagar.com

অভিশপ্ত বলে অভিহিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং কোথাও যদি প্রিয়ভাজন বুঝানোর জন্য বৎস শব্দ ব্যবহার করেন, তাতে আশ্চর্যের কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু ইহুদীরা এ মর্যাদাকে শুধু ইহুদী, হিব্রু এবং ইসরাঈলীদের জন্য সীমাবদ্ধ মনে করল। তারা বুঝতে পারল না যে, এটা যে কোনো জাতি যারা প্রতি যুগের নবীদেরকে মান্য করেছে তাঁর আনীত বিধানের আনুগত্য করেছে এবং সত্যের উপর অবিচল রয়েছে।

এ ধরনের আরো অনেক বিভ্রান্তিমূলক ধারণা তাদের মনে বসে গিয়েছিল। সবই তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের থেকে শিখেছিল। কুরআনে কারীম এসব বিকৃতিকে যথোপযুক্ত খণ্ডন করেছে।

আয়াত গোপন রাখা

ইহুদী আলিমরা নিজেদের মর্যাদাময় খ্যাতি বা উন্নত পদ লাভের জন্য তাওরাতের বিভিন্ন আয়াত ও বিধি-বিধান গোপন করত। যেন তাদের প্রতি সাধারণের আস্থা নষ্ট না হয়ে যায় এবং সেসব আয়াতের বিধি-বিধান না আনার কারণে নিন্দিত না হয়।

উদাহরণ :

১. তাওরাতে ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলাকে পাথর মেরে হত্যা করার বিধান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের ধর্ম যাজকদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এর পরিবর্তে কোড়া মারা এবং মুখে কালি মাখার বিধান নির্ধারণ করে। ফলে তারা পূর্বের বিধান বাস্তবায়নে অবহেলা করত। আর তারা এটা করেছিল অপমানের আশঙ্কায়।

২. যেসব আয়াতে হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে একজন নবী আবির্ভাবের সুসংবাদ রয়েছে। যেসব আয়াতে হেজাযে একটি জাতির প্রসিদ্ধ ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে, যাদের লাব্বায়িকের আওয়াজে আরাফাতের ময়দান মুখরিত হবে দেশ-দেশান্তরের মানুষ সেখানে একত্রিত হবে। এগুলো আজও তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে। প্রথমে ইহুদীরা এসব আয়াতের অর্থগত বিকৃতি ঘটানের চেষ্টা করল। তারা বলল, এখানে শুধু একটা নতুন জাতির অভ্যুদয়ের সংবাদ দেয়া হয়েছে মাত্র। কিন্তু আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করতে বলা হয়নি। মুসলমানদের সাথে তাদের পরাজয়ের ব্যাপারে তারা বলত। এগুলো আমাদের ভাগ্যে লিখিত লড়াই।

তারা যখন দেখল, এসব দুর্বল ব্যাখ্যা কেউ শোনে না, কারো কাছে স্বীকৃতি পায় না, তখন তারা পরস্পর পরামর্শ করে তা লুকিয়ে রাখত। সাধারণ এমনকি বিশেষ

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের সামনে তা প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিল। ইহুদীদের মধ্যে যারা মুনাফিক ছিলো তারা এসব কথা মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিত। তখন অন্যরা তিরস্কার করে তাদেরকে যা বলত, তা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এভাবে বর্ণনা দেন :

أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ـ

অর্থাৎ, নিজেদের কিতাব সম্পর্কে এসব বিষয় মুসলমানদের কাছে বর্ণনা কর কেন? এর দ্বারা মুসলমানরা তোমাদের রবের সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবে যে, তোমরা শেষ নবীর সত্যতা উপলব্ধি করেও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করনি। তখন তো তোমরা চুপ মেরে যাবে।

কত ভীষণ মূর্খতা! হযরত হাজেরা ও ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে নবী প্রেরণ এবং নতুন উম্মতের আত্মপ্রকাশের কথা গুরুত্বসহকারে বলা, শুধু কি সংবাদের জন্যই? পরবর্তী ইহুদীরা কোনো ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের ঐক্যমত্য সিদ্ধান্ত শরীয়তের অকাট্য প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত ধারণা করে তাদের উদ্ভাবন করা ঐসব বিধি-বিধানকে মূল তাওরাতের অন্তর্ভুক্ত করে দিল। পূর্ববর্তীদের ঐক্যমত্য ছাড়া হযরত ঈসা (আ)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করার কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছিলো না। এছাড়া আরো অনেক বিধি-বিধানের ব্যাপারে তাদের এমন অবস্থা ছিলো।

আল্লাহর নামে অপবাদ

ইহুদীরা আল্লাহর নামে বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করত। এর কয়েকটি কারণ ছিলো :

১. গভীরে প্রবেশ।

২. কঠোরতা।

৩. ভাল মনে করা অর্থাৎ ভাল মনে করে তাওরাতে না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন বিধি-বিধান তৈরী করা। আর মনগড়া এসব বিধি-বিধান প্রচার প্রসার করা।

শিথিলতা প্রদর্শনের কারণ

ইহুদীরা তাদের বিধি-বিধানের উপর আমল করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট শিথিলতা প্রদর্শন করত। লোভ-লালসা ও কৃপণতায় তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এ ধরনের শিথিলতা এবং বদ অভ্যাসগুলো কু-প্রবৃত্তির চাহিদার ফলশ্রুতি। এটা সবাইকেই পরাভূত করে ফেলে। কিন্তু যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় তারা এ থেকে পরিত্রাণ পান। যেমন- ইউসুফ (আ)-এর ভাষ্য কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيْ ج اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ـ

www.pathagar.com

অর্থাৎ, "আমি আমার মনকে নির্দোষ বলি না মন নিশ্চয়ই খারাপ কাজের প্ররোচনা দেয়। তবে আমার প্রতিপালক যার প্রতি করুণা করেন সে ছাড়া।" (সূরা ইউসুফ : ৫৩)

কিন্তু এসব খারাপ চরিত্রগুলো ইহুদীদের মধ্যে অন্য রঙ ধারণ করেছিল। তারা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সেসব দুশ্চরিত্রকে সচ্চরিত্র সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা করত। তারা তাদের অপকর্মগুলোকে ধর্মের রঙে প্রকাশ করত।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অসম্ভব ভাবার কারণসমূহ :

সেসব কারণে ইহুদীরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অসম্ভব ভাবত তার কারণ হলো :

১. স্ত্রীদের সংখ্যা কম-বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে নবীগণের অবস্থার ভিন্নতা ইত্যাদি।

২. শরীয়তের বিধি-বিধান প্রবর্তিত হওয়া।

৩. নবীগণের সাথে আল্লাহ তা'আলার আচরণের ভিন্নতা

৪. যুগ যুগ ধরে বনী ইসরাঈল বংশ থেকে নবীদের আগমনের পর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ইসমাঈল থেকে আগমন করা।

আরো এমন অনেক কারণে তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অসম্ভব বলে মনে করত।

নবীগণের শরীয়তে ভিন্নতার কারণ

এ ব্যাপারে আসল কথা হলো, নবীগণ আসেন মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য, তাদের ইবাদত-বন্দেগী সংশোধন করার জন্য, চরিত্র মার্জিত করার জন্য। পাপ-পুণ্যের মূলনীতি তৈরী করার জন্য নয়। প্রত্যেক জাতিরই ইবাদত-বন্দেগীতে, ঘরের কাজ কারবারে এবং নাগরিক রাজনীতিতে কিছু সুনির্ধারিত রীতি থাকে। নবী-রাসূলগণ এসে রাতা-রাতি তাদের এসব রীতি-নীতি পরিবর্তন করে নতুন রীতি-নীতি প্রণয়ন করেন না। বরং তাদের রীতি-নীতিতে তারতম্য করেন। তাদের মধ্যে যা ভাল পাওয়া যায়, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে, সেসব রীতি-নীতি রেখে দেন। আর যা মন্দ পাওয়া যায়, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে না, সেগুলোকে প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন ও সংস্কার করেন।

তেমনি ঘটেছে– আল্লাহর নিয়ামতসমূহ উল্লেখপূর্বক উপদেশ দেয়ার বিষয়টি এবং সৎ বান্দাদেরকে পুরস্কার দেয়া ও অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়া সম্পর্কিত ইতিহাস উল্লেখ করে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারটিও। এই হলো নবীদের শরীয়তে ভিন্নতার মূল কারণ।

www.pathagar.com

শরীয়তগুলোর পারস্পরিক বিরোধ ডাক্তারদের ব্যবস্থাপনার মতোই

শরীয়তসমূহের এসব বিরোধ রোগীদের ব্যাপারে ডাক্তারদের দেয়া ব্যবস্থাপত্রের মতো। দেখা যায়, ডাক্তার দু'জন রোগীর মধ্যে একজনকে ঠাণ্ডা ঔষধ এবং ঠাণ্ডা খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দেন। আবার অন্য রোগীকে গরম ঔষধ এবং গরম খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দেন। কিন্তু ডাক্তারের লক্ষ্য একটাই থাকে। আর তা হলো, রোগীর চিকিৎসা করা, তাদের শরীর থেকে বিষাক্ত জীবাণু নষ্ট করে দেয়া।

ডাক্তার প্রত্যেক এলাকার মানুষজনের অবস্থা, ঋতুর অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ এবং ভিন্ন ভিন্ন খাবার সেবনের পরামর্শ দিতে পারেন। এটা বিচিত্র কিছু নয়।

ঠিক তেমনি প্রকৃত মহাচিকিৎসক আল্লাহ তা'আলা যখন তার সৃষ্টি মানুষের আত্মিক রোগের চিকিৎসা করার ইচ্ছা করলেন, তাদের ভেতর ফেরেশতাসুলভ শক্তির বিকাশ ঘটাতে চাইলেন এবং তাদের মন-মেজাজকে উন্নত করে দিতে চাইলেন, তখন স্বভাবতই তিনি একেক জাতির জন্য তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির নিরিখে একেক সময় একেক ধরনের জীবন বিধান প্রদান করেছেন।

ইহুদী আলিমদের নমুনা

ইহুদী আলিমদের নমুনা দেখতে হলে দুনিয়াদার অসৎ মুসলমান আলিমদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। তারা তাদের পূর্বসূরিদের অন্ধ অনুকরণে আসক্ত। তারা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনাকেও এড়িয়ে যায়। তারা তাদের পূর্বসূরি আলিমদের 'জ্ঞানের গভীরতা', তাদের 'কঠোরতা' অথবা তাদের কাছে কোনো কিছু ভাল হিসেবে গণ্য হওয়ার উপর ভরসা করে চলে যারা নিষ্পাপ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী থেকে বিমুখ হয়ে বানানো জাল হাদীস ও তার অপব্যাখ্যাকে আদর্শ বানিয়ে বসে আছে। তাকিয়ে দেখুন! এরাই ওরা।

খ্রিস্টানদের আলোচনা ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস এবং তার জবাব

খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। তাদের ভ্রষ্টতা হলো, তারা আল্লাহ তা'আলাকে তিনটি সত্তার সমন্বিত রূপ মনে করতো। একদিক থেকে তিনটি ভিন্ন তিন সত্তা, আরেক দিক থেকে সমন্বিত অভিন্ন সত্তা, তারা এটাকে 'ত্রি-বিভূতি' বলে নামকরণ করেছিল। এর একটি হচ্ছে পিতার রূপ যা মহাবিশ্ব সৃষ্টির উৎস। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পুত্রের রূপ। যা প্রথম সৃষ্টির প্রতীক এবং সব সৃষ্টির তার ভেতর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়টি হচ্ছে জ্ঞানের রূপ। মহাপবিত্র আত্মা। তারা বিশ্বাস করত, হযরত জিব্রাঈল (আ) যেমন কোনো কোনো সময় মানুষের আকৃতি নিয়ে অবতীর্ণ হতেন, তেমনি আল্লাহর পুত্র রূপটি হযরত ঈসা (আ)-এর

www.pathagar.com

আকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং ঈসা (আ) একই সাথে আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র এবং মানুষ। তাই একই সাথে তাঁর প্রতি মানবিক বিধান এবং এলাহী বিধান প্রযোজ্য।

তারা তাদের এ আকীদাহকে প্রমাণ করার জন্য ইঞ্জিলের ঐসব আয়াতকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে যেগুলোতে হযরত ঈসা (আ)-কে 'পুত্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি ঐসব আয়াতের মাধ্যমেও তাদের আকীদাহ প্রমাণিত করতে চেয়েছে। সেগুলোতে আল্লাহ তা'আলার কাজকে হযরত ঈসা (আ) নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

প্রথম দাবির জবাব

এ বিষয়টি সর্বজনবিদিত যে, ইঞ্জিল তার মূল অবস্থায় অবশিষ্ট নেই। ইঞ্জিলের আলিমরা তাদের নিজ স্বার্থে তাতে বিকৃতি ঘটিয়েছে। ইঞ্জিলের যেসব আয়াতে ঈসা (আ)-কে 'পুত্র' বলা হয়েছে তা বিকৃত রূপ। সম্ভবত আসল ইঞ্জিলে এটা ছিলো না।

আর যদি মেনেও নেয়া হয় যে, মূল ইঞ্জিলে এ শব্দটি ছিলো, তাহলে জবাব হলো, তখনকার যুগে 'পুত্র' শব্দটি নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হতো। যা ইঞ্জিলেরই অন্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং ঈসা (আ)-কে 'পুত্র' বলে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দাবির জবাব

হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন কাজ যে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, এ দ্বারা নিজেকে কাজের কর্তা হিসেবে উপস্থাপন করা উদ্দেশ্য নয়। বরং এটা বর্ণনার একটা বিশেষ রীতি। যেমন– রাজার প্রতিনিধি কখনো বলে যে, আমরা অমুক শহর বা অমুক দেশ জয় করেছি বা অমুক দুর্গ ধ্বংস করে দিয়েছি। কিন্তু কাজটির মূল কর্তা আসলে রাজা নিজেই। আর প্রতিনিধি তো শুধু মুখপাত্র। এখানেও ঈসা (আ) বর্ণনাকে তাঁর কর্তা হওয়ার প্রমাণ দেয়া প্রতিনিধিকে রাজা বানিয়ে ফেলার মতো। প্রতিনিধি যেমন রাজা হতে পারে না, তেমনি ঈসা (আ)ও খোদা হতে পারেন না।

অথবা হতে পারে, ঈসা (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিলের পদ্ধতি ভিন্ন ছিলো, তাঁর কাছে হযরত জিব্রাঈল (আ) মানুষের আকৃতিতে আসতেন না, ঊর্ধ্বজগৎ থেকে সরাসরি তাঁর অন্তরে ওহী অবতীর্ণ হতো। ওহী আসার সাথে সাথে তাঁর কথাবার্তার ধরন বদলে যেত এবং তিনি আল্লাহর কাজকে নিজের কাজ বলে

www.pathagar.com

প্রকাশ করতেন। আসল ব্যাপারটা সবাই জানত। মোটকথা, এটা ঈসা (আ)-এর একটা বিশেষ বাকরীতি।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টানদের ভ্রান্তধর্মকে খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন, নিশ্চয় ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা, আর তার পবিত্র আত্মা। যা তিনি সতী মারইয়াম (আ)-এর গর্ভে ফুঁকে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জিব্রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে সাহায্য করেছেন এবং বিশেষভাবে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন।

সারকথা হলো, আমরা যদি মেনে নিই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে আত্মা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছেন পরে হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিতে রূপান্তর হয়েছেন। তাতেও তাদের দাবি প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহ ও ঈসা (আ) একে অন্যের মধ্যে মিশে অভিন্ন হয়ে আছেন। অভিন্ন অর্থ হলো দু'টো সত্তা এমনভাবে মিশে যাওয়া যে, তাতে দু'য়ের কল্পনাই আর থাকে না। আর এখানে আল্লাহ হলেন আত্মার স্থলে স্রষ্টা, আর ঈসা (আ)-এর মানব আকৃতি দেহের স্থলে সৃষ্টি। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি এ দু'টো যে ভিন্ন সত্তা তা আলোচনা করে বুঝানোর অপেক্ষা রাখে না। যালিম খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত এ ভাব প্রকাশের নিকটতম শব্দ হলো– তাকবীম (প্রতিষ্ঠা করা) বা অন্য কোনো শব্দ। এটা আল্লাহ তা'আলার শানে এমন অবমাননাকর শব্দ যা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

খ্রিস্টানদের নমুনা

আপনি যদি খ্রিস্টানদের এ দলের কোনো নমুনা এ যুগের মুসলমানদের মধ্যে দেখতে চান তাহলে আজকালকার পীর-মাশায়েখদের ছেলে-সন্তানদের প্রতি দৃষ্টি দিন। তারা তাদের বাপ-দাদাদের ব্যাপারে কেমন ধারণা পোষণ করে? তারা তাদের বাপ-দাদাদেরকে কোথায় নিয়ে পৌঁছিয়েছে! "যালেমরা শীঘ্রই জানতে পারবে তারা কোন পথে ফিরে যাচ্ছে!"

ঈসা (আ)-কে শূলে চড়ানোর বিশ্বাস এবং তার জবাব

তাদের আরেকটি ভ্রান্ত আকীদাহ হলো, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, ঈসা (আ)-কে শূলে চড়িয়ে নিহত করা হয়েছে। অথচ বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত হত্যাকারী। ইহুদীদের একজনকে ঈসা (আ)-এর আকৃতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। হত্যাকারীরা ঈসা (আ)-এর আকারে ঐ ব্যক্তিকে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে তাকেই শূলে চড়িয়ে হত্যা করল। আকৃতি বদলের অলৌকিক ঘটনাটি তারা বুঝতে পারল না। তারা ভাবল তিনি নিহত হয়েছেন। এ ভুল ধারণাটি তারা বংশানুক্রমে বলে আসছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা

www.pathagar.com

কুরআনে কারীমের মাধ্যমে ঘটনাটির রহস্যময় জট খুলে দেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন :

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ـ

অর্থাৎ, তারা তাকে ঈসা (আ)-কে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়ায়নি। আসলে (হত্যাকারীদেরই একজনকে ঈসার আকৃতি দেয়ার কারণে) তাদের সামনে তেমনি দেখাচ্ছিল।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে, ঈসা (আ) ইঞ্জিলে তাকে শূলে চড়ানোর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ইঞ্জিলের এ অংশটুকু যদি অবিকৃতও মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, ঈসা (আ) আসলে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, ইহুদীরা তাকে হত্যার জন্য আক্রমণ করতে চাইবে। কিন্তু তারা এ ক্ষেত্রে সফল হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন।

এ সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ)-এর সাহাবীদের সে বক্তব্য পাওয়া যায়। তাও ঘটনার অস্পষ্টতা থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে প্রকৃত ধারণা না থাকার কারণে। কেননা এ ধরনের ঘটনা তারা কখনো দেখেনি এবং শোনেওনি।

পারাক্লিতের সুসংবাদের ব্যাপারে বিকৃতি

তাদের আরেকটি ভ্রষ্টতা হলো, তারা বলে প্রতিশ্রুত 'ফারকলিত' বা পারাক্লিত হলেন ঈসা (আ) নিজেই যিনি নিহত হওয়ার পর তার সাহাবীদের কাছে ফিরে আসেন। আর তাদেরকে 'ইঞ্জিল' আঁকড়ে ধরার উপদেশ দেন। তারা আরো বলে, ঈসা (আ) তাদেরকে আরো উপদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, আমার পরে অনেক মিথ্যা নবীর দাবিদাররা আসবে। যিনি আমার নাম নিবেন তোমরা তার কথা গ্রহণ করবে। আর যে আমার নাম নিবে না, তার কথা প্রত্যাখ্যান করবে।

কুরআন মাজীদ এটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারেই সামঞ্জস্যশীল। তাদের ভাষায় নিহত হওয়ার পর তাদের কাছে আবার প্রত্যাবর্তনকারী ঈসা (আ)-এর আত্মিক আকৃতির ক্ষেত্রে তা সামঞ্জস্যশীল নয়। কেননা তাঁর ব্যাপারে ইঞ্জিলে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত পারাক্লিত তোমাদের মাঝে দীর্ঘদিন অবস্থান করবেন। জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। মানুষদের আত্মশুদ্ধি করবেন। এসব গুণাবলী আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে খাপ খায় না।

www.pathagar.com

ঈসা (আ) যে, তার শিষ্যদেরকে উপদেশ দিয়েছেন তোমরা তাকে গ্রহণ করবে এবং তার কথা মানবে যে আমার নাম নেবে। এটা তিনি এজন্য বলেছেন যে, আগত সত্য নবী সেই হবে যে তাঁর (ঈসার) নবুওতের স্বীকৃতি দিবে। তিনি এটা এজন্য বলেননি যে, আগত নবী যেন তাঁকে (ঈসাকে) রব বানিয়ে নেন বা তিনি যেন তাঁকে (ঈসাকে) আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করেন!

মুনাফিক

মুনাফিকী দুই ধরনের। ১. বিশ্বাসগত মুনাফিকী। ২. কার্যকলাপগত মুনাফিকী। এ হিসেবে মুনাফিক লোকেরাও দু'প্রকারের।

এক. এক দল হলো, যারা মুখে বলত– আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর অন্তরে কুফর লালন করে প্রশান্ত। মনের গভীরে তারা আল্লাহ রাসূলের প্রতি অস্বীকার লুকিয়ে রাখত। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারেই ইরশাদ করেন :

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।" (সূরা নিসা : ১৪৫)

দুই. আরেক দল হলো, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু তারা ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলো। ইসলামী আকীদার প্রতি পূর্ণ আস্থা তাদের ছিলো না।

কার্যকলাপগত মুনাফিকীর বহির্প্রকাশ

মুনাফিকদের থেকে কয়েকভাবে তাদের মুনাফিকী প্রকাশ পেত।

এক. কোনো কোনো মুনাফিক এমন ছিলো। তাদের মধ্যে স্বজাতির অনুসরণ চেতনা এতো প্রবল ছিলো যে, জাতি যদি ঈমানের উপর অটল থাকত তাহলে তারাও তাদের ঈমানে অটল থাকত। আর যদি জাতির পদস্খলন হতো তখন তারাও পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

দুই. কারো কারো অন্তর দুনিয়ার চাকচিক্যের মোহে এমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, আল্লাহ রাসূলের জন্য ভালবাসার কোনো স্থান তাদের মনে অবশিষ্ট থাকত না।

তিন. কোনো কোনো মুনাফিক এমন ছিলো, যাদের মনে সম্পদ লিপ্সা, হিংসা-বিদ্বেষ ও কৃপণতার মতো মন্দ চরিত্র শিকড় গেড়ে বসেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করতে গিয়ে তারা কোনো স্বাদ অনুভব করত না এবং ইবাদত-বন্দেগীর কোনো বরকত লাভ করতে পারত না।

চার. অনেকে এমনও ছিলো, যারা জীবন জীবিকা অর্জনের ব্যস্ততায় এমনভাবে

www.pathagar.com

ডুবে গিয়েছিল যে, পরকালীন মুক্তির জন্য আমল করা এমনকি সে ব্যাপারে চিন্তারও কোনো সুযোগ তারা পেত না।

পাঁচ. অনেকে আবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের ব্যাপারে মনে সন্দেহ পোষণ করত, যা একেবারেই ভিত্তিহীন। কিন্তু সন্দেহটা এতো প্রকট নয় যে তারা ইসলাম ধর্মকে ছেড়ে দেবে। তাদের সন্দেহের কারণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ ছিলেন। তারা নবীজিকে তাদের মতো মানুষ দেখে হতাশ হতো। আরেকটি কারণ হলো, ইসলাম অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের রাজত্বের প্রসারের মতোই বাহ্যত ইসলামও প্রসার লাভ করছিল। এমন আরো অনেক কারণে তারা নবীজির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করত।

ছয়. কেউ কেউ এমনো ছিলো, যারা স্বগোত্রের প্রতি এতো দুর্বল ছিলো যে, তাদেরকে বা নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনে মুসলমানদের বিরুদ্ধেও কাজ করত। যদি এতে ইসলামের ক্ষতি হতো, এর তোয়াক্কা তারা করত না। স্বজাতির ভালবাসায় ইসলামকে দুর্বল করে ক্ষতি পক্ষাবলম্বন করত।

মুনাফিকীর উভয় প্রকার সম্পর্কে আলোচনা

আকীদাহগত মুনাফিকী একটা গোপনীয় ব্যাপার। এ যুগে এ সম্পর্কে ধারণা নেয়া অসম্ভব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী আসত। ওহীর মাধ্যমে তিনি জানতে পারতেন, কারা কারা বিশ্বাসের মুনাফিকীতে লিপ্ত। তাঁর ইন্তেকালের পর ওহীর দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এখন আর এ ধরনের আকীদাহ-বিশ্বাসের মুনাফিককে পরিচয় করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় প্রকারের মুনাফিকী আমল-আখলাক বা কার্যকলাপগত বিভিন্ন আলামত দেখে অবগত হওয়া সহজ। আমল আখলাকের মুনাফিকী এ যুগে অধিকাংশ লোকের মধ্যে পাওয়া যাবে। এ ধরনের মুনাফিকীর প্রতি ইঙ্গিত করেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ـ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ـ

অর্থাৎ, সে লোকের মধ্যে চারটি বদঅভ্যাস থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। ১. তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খেয়ানত করে। ২. কথা বললে মিথ্যা বলে।

www.pathagar.com

৩. প্রতিজ্ঞা করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪. ঝগড়া শুরু করলে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে।[১]

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

هَمُّ الْمُنَافِقِ بَطْنُهُ وَهَمُّ الْمُؤْمِنِ فَرَسُهُ .

অর্থাৎ, মুনাফিকের পুরো চিন্তাটাই থাকে তার পেটকে নিয়ে। আর মু'মিন তার (জিহাদের) ঘোড়ার ব্যাপারে বেশি চিন্তাশীল থাকে। (মু'মিনের কাছে তাঁর দ্বীন-ধর্মই বড়)

আল-কুরআনে মুনাফিকদের কথা আলোচনার উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আযীমের মধ্যে মুনাফিকদের অসচ্চরিত্র ও অসদাচরণ সম্পর্কে খোলাখুলি বর্ণনা দিয়েছেন এবং উভয় প্রকারের মুনাফিকদের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। যেন উম্মত এসব থেকে বাঁচতে পারে, সতর্ক থাকে।

আপনি যদি সে যুগের মুনাফিকদের আধুনিক সংস্করণ দেখতে চান, তাহলে মন্ত্রী-মিনিস্টার ও শাসনকর্তাদের সভা-সমাবেশে হাজির হয়ে তাদের মুখবাজী এবং তাদের কর্মচারীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। দেখবেন– সবাই জী হুজুরের দল! বস বা উপরোক্ত অফিসারের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিকে কীভাবে তারা কুরবানী করছে।

একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কাছে রাসূলের যুগের মুনাফিক যারা রাসূলের কথা শোনার পরও এবং অকাট্যভাবে শরীয়তের বিধি-বিধান জানার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং এ যুগের তথাকথিত শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী নামধারী ব্যক্তিরা কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের সত্যতার ব্যাপারে চুপ থাকা সত্ত্বেও এসবের ব্যাপারে নানা রকম সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে এবং তা মানুষের সামনে প্রচার করে। উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাবে না। আসলেই এরা তৎকালীন মুনাফিকদের জ্বলন্ত নমুনা।

আল-কুরআন চিরন্তন মহাগ্রন্থ

কুরআন সব যুগের মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। আপনি যখন কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করবেন, তখন কুরআনের বিভিন্ন ঘটনাবলী দেখে এটা ভাবতেন না যে,

---

১. হযরত মাও. সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা. বা.) বলেন– হাদীসটি উভয় প্রকার মুনাফিকীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একই সাথে ৪টি বদঅভ্যাস এক লোকের মধ্যে থাকলে ধরতে হবে সে নির্ভেজাল আসল মুনাফিক। তার চেয়ে কম হলে ২য় প্রকারের অন্য দিক। এ ছাড়াও অনেক হাদীসে মুনাফিকদের আলামত বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

এখানে যেসব ঘটনাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে তা তো অতীত হয়ে গেছে। না! কখনো না! আগেকার যুগের মানুষের যেসব ক্রিয়াকলাপের নতুন রূপী কাজকর্ম ও নতুন সংস্করণ আপনার যুগেও রয়েছে। আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে এভাবেই সুবিন্যস্ত করেছেন। যেন প্রত্যেক যুগের পাঠকই বুঝতে পারে যে, কুরআন আমাদেরকেও উদ্দেশ্য করে পথনির্দেশ করছে।

যেমন- হাদীসে এসেছে : لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ...

অর্থাৎ, "নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে অনুসরণ করবে।..." (বুখারী-মুসলিম)

কুরআন সেসব নির্ধারিত ঘটনাবলী বর্ণনা করেছে, বাহ্যত এটা কুরআনের লক্ষ্য নয়। বরং ঐসব ঘটনাবলীর একটা মূলনীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কুরআনের মূল লক্ষ্য।

বিপথগামী দল-উপদলসমূহের আকীদাহ-বিশ্বাস এবং এ সবের জবাব সম্পর্কিত যেটুকু আলোচনা-পর্যালোচনা আমার জন্য সহজসাধ্য ছিলো তা পরিবেশন করা হলো। আমি মনে করি 'আয়াত জাদল'-এর ব্যাখ্যা বুঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। (ইন্‌শাআল্লাহ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চইল্‌মের পরিশিষ্ট

সবারই এটা জানা থাকা উচিত, আল-কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষের আত্মিক সংশোধনের জন্য। চাই সে আরবী হোক বা অনারব, গ্রাম্য হোক বা শহুরে। এ জন্য এলাহী কৌশল এভাবে অবলম্বন করা হলো যে, আল্লাহর নেয়ামতরাজি স্মরণ করিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে এমন বর্ণনারীতি অনুসরণ করা হলো, যেন মানুষ অনুধাবন করতে পারে। বুদ্ধি-বিবেচনা যাকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। এসব আলোচনা-পর্যালোচনায় যেন বাড়াবাড়ি না হয়, তাই আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর কথা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, লোকেরা যেন তাদের স্বাভাবিক মেধা ও বিচক্ষণতা দিয়ে তা বুঝতে পারে। এসব অনুধাবন করার জন্য যেন দার্শনিক মতাদর্শ এবং আকাঈদ শাস্ত্রে পারদর্শী হতে না হয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অস্তিত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। কেননা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি বিদ্যমান। তাই সুস্থ পরিবেশে ও তার

www.pathagar.com

পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে দেখা যায় না।

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী

চিন্তা গবেষণা করে মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর মূলতত্ত্ব সহজ সরলভাবে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। আর যদি মানুষ আল্লাহর গুণাবলীর সঠিক পরিচয় লাভে ব্যর্থ হয় তাহলে তার অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য আত্মশুদ্ধির কাজ আঞ্জাম দেয়াও সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা তার হিকমতের চাহিদানুযায়ী মানুষের জন্য সুপরিচিত কিছু পরিপূর্ণ গুণাবলী নির্বাচন করেন। যেন তারা তা অর্জন করে প্রসংশিত হতে পারে। মানুষের এসব গুণগুলোকে তাঁর একান্ত সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য গুণের বিপরীতে দাঁড় করালেন, যেসব গুণাবলী বুঝতে মানুষ তার ধারে কাছেও ভিড়তে পারে না।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ (তাঁর মত কিছুই নেই) বাক্যটির বর্ণিত মূলনীতিতে যারা মূর্খ হয়েও নিজেকে জ্ঞানী মনে করে তাদের জন্য তাদের দুরারোগ্য ব্যাধির মহৌষধ বানিয়েছেন।

আর মানবিক গুণাবলী যা মানুষকে ভ্রান্ত আকীদাহ-বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করে তা আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করতে নিষেধ করেছেন। যেমন– আল্লাহর সন্তান, কান্না, উদ্বেগ ও অস্থিরতা ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার মর্যাদাময় অবস্থান এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী সুনির্ধারিত

যদি তুমি আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর দিকে গভীর দৃষ্টি দাও, তাহলে তোমার কাছে এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে যে, মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানের উপর বহাল থেকে কোন কোন মানবীয় গুণের সংযোজন মৌলিক আকীদাহ-বিশ্বাসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না। আর কোন্ কোন্‌টি করে তার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা ভীষণ সূক্ষ্ম ও কঠিন ব্যাপার। এটা মানবিক জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম, এটা অবশ্যই চুপ থাকার ও নীরব থাকার বিষয়। এখানে নিজ খেয়াল খুশীর মতামত উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন এবং নেয়ামতসমূহের মধ্যে কুরআনে কারীমে শুধু সেসবই উল্লেখ করা হয়েছে, যা শহরবাসী বা গ্রামবাসী, আরব বা অনারব সবাই বুঝতে পারে। এজন্যই আধ্যাত্মিক নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করেননি যা ওলামা এবং আওলিয়ায়ে কিরামের জন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তেমনি যেসব নেয়ামত রাজা বাদশাদেরকে দান করা হয় তাও বর্ণনা করেননি, আল্লাহ তা'আলা শুধু ঐসব নেয়ামতের আলোচনা করেছেন যা সবার জন্য উপযোগী। যেমন আসমান-জমিন সৃষ্টি, মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা, আর তাকে নদী-নালায় প্রবাহিত করা, পানির সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ফল-ফুল উৎপন্ন করা, মানুষকে জরুরি কারিগরি ধারণা অন্তরে ঢেলে দেয়া এবং সেসব চর্চা ও অনুশীলনের শক্তি দান করা।

অনেক জায়গায় মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক স্খলনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাদের আত্মিক স্খলন হলো, দুঃখ-কষ্টের সময় তাদের অবস্থা এক রকম থাকে আর আরাম আয়েশের সময় আরেক রকম, বিপদাপদ এলে এক রকম আর তা দূর হয়ে গেলে আরেক রকম হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষেত্রে অনুগত বান্দাদেরকে পুরস্কার দেয়া এবং অবাধ্যদের শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে এমন সব ঘটনা বেছে নিয়েছেন যা তারা আগে থেকে শুনে আসছিল। যেসব শুনে তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, যেমন নূহ (আ.) ও আদ ও সামুদ জাতির ঘটনাবলী, যা তারা পুরুষানুক্রমে শুনে আসছিল। তেমনি ইব্রাহীম (আ.) ও বনী ইসরাঈলী নবীদের কাহিনী তারা ইহুদীদের সংস্পর্শে থেকে থেকে শুনে আসছিল। কুরআনুল কারীমে বস্তুত এসব ঘটনাবলীই বেশি করে বর্ণনা করা হয়েছে। যেসব ঘটনা আরবরা কম শুনেছে বা ইরান ও ভারতের যেসব ঘটনাবলীর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল না সেসব ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়নি।

কুরআনে ঘটনা বর্ণনার আঙ্গিক ও লক্ষ্য

কুরআনে যেমন অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত হয়নি, তেমনি বর্ণিত ঘটনার পুরো অংশ স্ববিস্তারে উল্লেখ করা হয়নি। শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যেটুকু বর্ণনা করা দরকার শুধু সেটুকুই বর্ণিত হয়েছে, এভাবে ঘটনা বর্ণনা করার কৌশলগত উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যখন কোন নতুন ও আশ্চর্যজনক ঘটনা শোনে তা তাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তখন তারা ঘটনার ভেতর নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে। ঘটনার বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য 'শিক্ষা গ্রহণ করা' সেটা আর অর্জিত হয় না, যেমন- একজন আল্লাহওয়ালা বলেছেন :

"মানুষ যে দিন থেকে তাজবীদের কায়দা কানুন আয়ত্ত করা শুরু করেছে, সেদিন থেকে তিলাওয়াতের একাগ্রতা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। আর যেদিন থেকে মুফাস্‌সির আলিমগণ কুরআনের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয়াবলী ও দূর দূরান্তের আলোচনা তাফসীরের ক্ষেত্রে সংযোজন করতে থাকল, সেদিন থেকে তাফসীর শাস্ত্র অন্তঃসার শূন্য হয়ে গেল।"

www.pathagar.com

আল-কুরআনে বারবার উল্লিখিত ঘটনাবলী

আল-কুরআনে যেসব ঘটনাবলী বারবার আলোচিত হয়েছে এগুলো হলো :

১. আদম (আ.) কে কাদামাটি থেকে সৃষ্টির কাহিনী তাঁকে ফেরেশতাদের সিজদা করা, সিজদার ব্যাপারে শয়তানের অহংকারবশতঃ অস্বীকার করা, সে অভিশপ্ত হওয়া, তারপর আদম জাতিকে পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত ঘটনাবলী।

২. আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে নূহ, হূদ, সালেহ, ইব্রাহীম, লূত ও শুয়াইব (আ.) এবং তাদের নিজ নিজ জাতির সাথে বিতর্কের ঘটনাবলী। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সংক্রান্ত কাহিনীসমূহ। অহংকারের বশবর্তী হয়ে জাতির ঈমান আনতে অস্বীকৃতি, তাদের পক্ষ থেকে খুঁটিনাটি প্রশ্ন উথাপন এবং নবীদের পক্ষ থেকে তার জবাব। জাতি খোদায়ী আযাবে পতিত হওয়া এবং নবী ও তাঁর অনুসারীদের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসার ঘটনাবলী।

৩. ফিরাউন, তার সভাষদ এবং বনী ইসরাঈলের বোকা লোকদের সাথে সংঘটিত ঘটনাবলী, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তাদের অহংকার প্রদর্শন, এ দুর্ভাগাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার শাস্তি এবং একের পর এক আল্লাহর সাহায্য মূসা (আ.)-এর পক্ষে প্রকাশ পাওয়া।

৪. হযরত দাউদ (আ.) ও সুলাইমান (আ.)-এর কাহিনী, উভয়ের খেলাফত, তাদের নিদর্শনাবলী ও মু'জিযার আলোচনা।

৫. আইয়ূব (আ.) ও ইউনুস (আ.)-এর পরীক্ষা সংক্রান্ত কাহিনী এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত নাযিল হওয়া।

৬. যাকারিয়া (আ.)-এর দু'আ এবং তা আল্লাহ তা'আলা কবুল করার কাহিনী।

৭. হযরত ঈসা (আ.)-এর আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী। পিতৃহীন অলৌকিক জন্ম, কোলে থাকাকালিন তাঁর কথা বলা এবং তার হাতে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার আলোচনা।

আল-কুরআনে এ কাহিনীগুলো সূরার বর্ণনাভঙ্গির আঙ্গিকে কোথাও সংক্ষিপ্ত আবার কোথাও স্ববিস্তারে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সেসব ঘটনা কুরআনে একবার বা দু'বার উল্লিখিত হয়েছে :

যেসব ঘটনা আল-কুরআনে বারবার আলোচিত হয়নি বরং কয়েক জায়গায় এসেছে, সেগুলো হলো–

১. হযরত ইদ্রীস (আ.) কে উচ্চস্থানে উন্নীত করার ঘটনা। (মারইয়াম-৫৬-৫৭)

২. ইব্রাহীম (আ.) ও নমরুদের মাঝে অনুষ্ঠিত বিতর্কের ঘটনা। (বাকারা-২৫৮)

www.pathagar.com

৩. হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পাখি জীবিতকরণ প্রত্যক্ষ করার ঘটনা। (বাকারা-২৬০)

৪. হযরত ইব্রাহীমের একমাত্র সন্তান ইসমাঈল (আ.) কে জবাই করার ঘটনা। (সফ্ফাত-১০২-১০৫)

৫. ইউসুফ (আ.)-এর জন্ম ঘটনা।

৬. মূসা (আ.)-এর জন্ম এবং তাঁকে নদীতে ফেলে দেয়ার ঘটনা। (কসাস- ৭; তো-হা-৩৮-৩৯)

৭. কিবতী বংশোদ্ভূত লোককে হত্যার ঘটনা। (কসাস-১৫)

৮. মাদায়েনের দিকে তাঁর চলে যাবার ঘটনা। (কসাস-২২)

৯. মাদায়েনে তাঁর বিবাহের ঘটনা। (কসাস– ২৭)

১০. মূসা (আ.) কর্তৃক গাছের উপর আগুন দেখার ঘটনা। (তো-হা-১০; কসাস-২৯)

১১. গাছ থেকে আল্লাহ তা'আলার কথা শোনার ঘটনা। (কসাস-৩০)

১২. গাভী জবাই করার ঘটনা। (বাকারা-৬৭-৭৩)

১৩. মূসা (আ.) এবং খিযির (আ.)-এর সাক্ষাতকারের ঘটনা। (কাহাফ-৬৫)

১৪. তালুত ও জালুতের ঘটনা। (বাকারা-২৪৬-২৫১)

১৫. বিলকিসের ঘটনা। (নামাল-২২-৪৪)

১৬. যুলকারনাইনের ঘটনা। (কাহাফ-৮৩-৯৮)

১৭. আসহাবে কাহাফের ঘটনা। (কাহাফ-৯-২২)

১৮. দুই ব্যক্তির কথোপকথনের ঘটনা। (কাহাফ-৩২-৪৪)

১৯. বাগানের মালিকদের ঘটনা। (কলম-১৭-৩৩)

২০. হযরত ঈসা (আ.)-এর পাঠানো তিনজন প্রতিনিধির ঘটনা। যাদেরকে দ্বীন প্রচারের জন্য তিনি পাঠিয়েছিলেন। (ইয়াসীন-১৩-২৯)

২১. কাফের গোষ্ঠী কর্তৃক একজন মুমিনকে শহীদ করার ঘটনা। (ইয়াসীন-২০-২৭)

২২. হস্তীবাহিনীর ঘটনা। (সূরা ফীল)

কুরআন কারীমে এসব ঘটনাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য শুধুই কাহিনী শোনানো নয়। বরং এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, পাঠক এবং শ্রোতার মেজাজকে শিরক এবং গুনাহর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনকারী করে গড়ে তোলা, শিরক এবং গুনাহর কারণে মহান আল্লাহর শাস্তির প্রতি ভীতু বানানো এবং মুমিনদেরকে আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে আস্থাশীল করা, আল্লাহর জন্য একাগ্রচিত্ত বান্দাদের প্রতি মহান আল্লাহর দয়া ও দানের কথা প্রকাশ করা।

www.pathagar.com

মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণের দাওয়াত

মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা হলো :

১. মানুষের মৃত্যুর সময়ের অবস্থা।

২. মৃত্যুর সময় মানুষের অসহায়ত্ব।

৩. মৃত্যুর পর মানুষের সামনে জান্নাত-জাহান্নাম উপস্থাপন করা।

৪. মৃতের সামনে শান্তির ফেরেশতা আসা।

৫. কিয়ামতের আলামতসমূহ প্রকাশ পাওয়া। যেমন– হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ, 'দাব্বাতুল আরদ' বা মাটির জন্তুদের বের হয়ে আসা এবং ইয়াজুজ মাজুজের বের হয়ে আসা।

৬. সৃষ্টি জগতের সবাই বেহুঁশ হওয়ার জন্য ফুৎকার দেয়া।

৭. কিয়ামতের ফুৎকার।

৮. হাশরের ময়দান প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

৯. হাশরের ময়দানে বান্দার আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়া।

১০. পাপ-পুণ্যের পরিমাপের জন্য পাল্লা স্থাপিত হওয়া

১১. আমলনামা ডান হাতে কিংবা বাম হাতে দেয়া,

১২. মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশ করা এবং কাফেরদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

১৩. জাহান্নামে নেতা ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে বাদানুবাদ অনুষ্ঠিত হওয়া। পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করা এবং অঙ্গীকার করা।

১৪. পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দেয়া।

১৫. বিশেষভাবে মুমিনদের আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা।

১৬. জাহান্নামে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা যেমন– শিকল ও বেড়ি পরিয়ে দেয়া, ফুটন্ত পানি, পুঁজ ও তিক্ত যাক্কুম ফল খেতে দেয়া।

১৭. জান্নাতে বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার প্রদান করা। যেমন– হুর, সুরম্য অট্টালিকা, মধু, শরবত ও স্বচ্ছ পানির নদী, স্বাস্থ্যকর ও মজাদার খাবার, আরামদায়ক পোশাক, সুন্দরী নারী, চিত্ত বিনোদনের জন্য উত্তম কৌতুক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়া, যা দ্বারা মনের প্রশান্তি অর্জিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয়গুলো কুরআনে পাকের বিভিন্ন সূরাতে প্রাসঙ্গিক অবস্থাভেদে কখনো সংক্ষেপে আবার কখনো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

আইন সম্পর্কিত জ্ঞান

আইনি আলোচনার মূলনীতি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইব্রাহীমী মতাদর্শের উপর পাঠানো হয়েছে। সুতরাং তার শরীয়তকে বহাল রাখা উচিত ছিল এবং মৌলিক ব্যাপারগুলোতে কোন পরিবর্তন সাধন করারও কথা নয়। তবে সাধারণ মামলাগুলোকে শর্তাদি আরোপ করে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা ও সময়-সীমারেখায় বৃদ্ধি ঘটানো সেটা আলাদা ব্যাপার ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আরবদেরকে সংশোধন করবেন। আর আরবদের মাধ্যমে পুরো আরব উপসাগরীয় অঞ্চলকে সংশোধন করবেন। এ লক্ষ্যের প্রেক্ষাপটে এটা জরুরি ছিল যে, আরবদের শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকেই শরীয়তের মূলধারা প্রবর্তিত হবে।

আপনি যদি ইব্রাহীমী মতাদর্শের দিকে তাকান, আরবদের শিক্ষা-সংস্কৃতির দিকে গভীর দৃষ্টি দেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত প্রবর্তনের ব্যাপারটি যদি চিন্তা করেন যা ছিল মূলত সংস্কার প্রক্রিয়া এবং সুসংস্কৃতিতে রূপান্তর করা। এসব ব্যাপারে একটু চিন্তা করলেই জানা যাবে যে, প্রত্যেকটি বিধি বিধিনের পেছনে কোন না কোন কারণ ছিল, প্রত্যেকটি আদেশ-নিষেধের জন্য কোন না কোন কল্যাণ নিহিত ছিল। এ সম্পর্কিত চিন্তা ধারণা দিতে হলে লম্বা আলোচনা প্রয়োজন।

বিকৃত ইব্রাহীমী মতাদর্শের সংস্কারে ইসলামী শরীয়তের অবদান

তৎকালিন আরবরা ইবাদত যেমন– পবিত্রতা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং আল্লাহর যিকিরের ব্যাপারে চরম অবক্ষয়ে ডুবে ছিল। তারা তখন এসব পালনে ভীষণ অনীহা প্রদর্শন করে চলছিল। এ সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। ফলে এ সব ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের মতভেদ তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং মূল মতাদর্শ থেকে দূরে সরে পড়ে জাহিলী বিকৃতির শিকার হয়ে যায়।

তখনই কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়। এ মহাগ্রন্থ তাদের ঐসব জাহিলী ধর্ম বিকৃতিকে সংশোধন করে পুরোপুরিভাবে। ইবাদতসমূহের মূলরূপকে তুলে ধরে তাকে সুদৃঢ় ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

ঘরোয়া সংস্কৃতিতে ক্ষতিকর অনেক কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। এতে তারা সীমালঙ্ঘন করে অনেক বাড়াবাড়ি করতে শুরু করে। ঠিক তেমনি রাষ্ট্র ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তখন মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীম এ দু'টো

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেরই নির্ভুল মূলনীতি সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করে। তার সীমারেখা ঠিক করে দেয়। এখানে মানুষ যেসব সগীরা গুনাহর শিকার হয়েছে তা স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরে। যেন উম্মত এসব গুনাহ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে।

কুরআন সংক্ষিপ্তাকারে এবং হাদীস সবিস্তারে বর্ণনা উপস্থাপন করে

কুরআনে কারীম নামাযের মাসালা খুব সংক্ষেপে উপস্থাপন করে। এ ক্ষেত্রে যে বাক্যটি ব্যবহার করে তা হলো- إِقَامَةُ الصَّلَاةِ (নামায প্রতিষ্ঠা করা) আর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযান, মসজিদ তৈরী, জামাতের সাথে নামায আদায় করা এবং সুনির্ধারিত সময়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। ঠিক তেমনি কুরআনুল কারীম যাকাতের মাসালাও সংক্ষেপে উপস্থাপন করে। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যথোপযুক্ত ব্যাখ্যাসহকারে বর্ণনা দেন। সূরা বাকারাতে রোযার কথা উল্লেখ করেন। সূরা হজ্জে হজ্জের ব্যাপার পেশ করেন। সূরা-বাকারা, সূরা আনফাল এবং আরো অন্যান্য জায়গায় জিহাদের আলোচনা করেন। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক গুনাহের শাস্তির বিধান সূরা মায়েদা এবং সূরা নূরে উপস্থাপন করেন। সূরা নিসাতে উত্তরাধিকারের আইন, বিবাহ ও তালাকের আইন সূরা বাকারা, সূরা নিসা, সূরা তালাক ও অন্যান্য সূরাতে উপস্থাপন করেন।

যেসব সংক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যাখ্যার দাবি রাখে

ইতোপূর্বে কুরআনুল কারীমের যেসব আয়াত সবাই সহজে বুঝতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ঐসব আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, যা পড়ামাত্রই বুঝে আসে না। যেমন-

১. কোন আয়াত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এবং তিনি তার জবাব দিয়েছেন।

২. কোন একটি ঘটনায় মুসলমানগণ তাদের জান-মাল ব্যয় করে ত্যাগ ও কুরবানীর দৃষ্টান্ত পেশ করলেন আর মুনাফিকরা সেসব প্রত্যাখ্যান করে প্রবৃত্তির পেছনে ছুটল। ফলে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রশংসা করলেন এবং মুনাফিকদের সমালোচনা ও নিন্দা করলেন। তাদের এ অবাধ্যতার দরুন তাদের নিশ্চিত শাস্তিরও ভয় দেখালেন। অথবা,

৩. শত্রুর উপর বিজয়ের ঘটনা ঘটল। তাদের অনিষ্টতা থেকে মুমিনগণ নিরাপদ হলেন। এ বিজয় ও অনিষ্টতা মুক্তির মহানিয়ামত আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে দান করলেন। তা তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অথবা,

www.pathagar.com

৪. মুমিনদের সাথে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া দরকার। ধমক বা ইশারা-ইঙ্গিত করা দরকার বা কোন আদেশ-নিষেধ করা দরকার, তখন আল্লাহ তা'আলা সে ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেন। এসব ক্ষেত্রে মুফাস্‌সিরগণের দায়িত্ব হলো, সংক্ষেপে সেসব ঘটনাবলী বর্ণনা করা। যেমন–

১. সূরা আনফালে বদরের যুদ্ধের ঘটনা।

২. সূরা আলে ইমরানে উহুদ যুদ্ধের ঘটনা।

৩. সূরা আহযাবে খন্দক যুদ্ধের ঘটনা।

৪. সূরা ফাত্‌হে হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা।

৫. সূরা হাশরে বনু নযীরের সাথে যুদ্ধের ঘটনা।

৬. সূরা বারাআতে তাবুক যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ ও তার প্রতি উৎসাহ বাণী।

৭. সূরা মায়েদাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে বিদায় হজ্জের কথা।

৮. সূরা আহযাবে হযরত যায়নাব (রা.)-এর বিবাহের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৯. সূরা তাহরীমে দাসী হারাম ঘোষণা করার ঘটনা।

১০. হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনা সূরা নূরে।

১১. জীন প্রতিনিধিদের কুরআন মজীদ শোনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠে, তা উল্লিখিত হয়েছে সূরা জীনে এবং সূরা আহকাফে।

১২. মসজিদে যেরার বা ষড়যন্ত্রমূলক মসজিদ তৈরীর ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে সূরা বারাআতে।

১৩. সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতেই মি'রাজের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এসব আয়াতই মূলত تَذْكِيْرُ بِاَيَّامِ اللّٰهِ বা 'ঘটনা উল্লেখপূর্বক মানুষকে উপদেশ দানমূলক' আলোচনা কিন্তু যেহেতু এসব সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে, তাই এগুলো ভাল করে বুঝার ক্ষেত্রে সংঘটিত ঘটনাগুলো জেনে নেয়া প্রয়োজন। তাই এগুলোকে পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআনের সাহিত্যশৈলী বর্ণনাভঙ্গির দরুন উদ্ভূত দুর্বোধ্যতা ও তার সমাধান

এ যুগের লোকদের কাছে কুরআন মাজীদ বুঝা কেন কঠিন হয়? সে কাঠিন্য দূর করে সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে কুরআন বুঝার পন্থা এখানে আলোচনা করা হবে। জানা থাকা দরকার যে, কুরআন মাজীদ খাঁটি এবং সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে।

সাহাবায়ে কিরাম তাদের স্বভাবজাত ভাষাগত যোগ্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলার বাণী বুঝে নিয়েছিলেন। যদিও দু'য়েকটি জায়গায় তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুধাবন করা কঠিন হয়েছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংক্ষিপ্ত দু'য়েকটি বাক্যের মাধ্যমে সে দুর্বোধ্যতাও দূর হয়ে গিয়েছিল। (আল ফওজুল আযীম-১-২৩১)

যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ. – "শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।" (যুখরুফ-২)

আরো ইরশাদ করেন : قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

"আরবী ভাষায় কুরআনরূপে যেন তোমরা বুঝতে পার।" (ইউসুফ-২)

আরো ইরশাদ করেন :

كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ـ

"এটি এমন একটি কিতাব যার আয়াতসমূহ সুদৃঢ়, অতঃপর এক প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।" (হূদ-১)

প্রজ্ঞাময় মহান বিধান দাতার ইচ্ছা ছিল, কুরআনে যেসব মুতাশাবিহাত[১]

১. তাফসীর মূলনীতি বিশারদগণের এক দলের মতে 'মুতাশাবিহ' এর সংজ্ঞা হলো– مَالاَ طَرِيْقَ لِدَرْكِهٖ اَصْلاً. - অর্থাৎ যার অন্তর্নিহিত মর্মবাণী বুঝার আদৌ কোন পন্থা নেই। আরেক দল

www.pathagar.com

আয়াতসমূহ রয়েছে, তাতে যেন কেউ কোন ধরনের চিন্তা গবেষণা না করে, যেসব আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করা দুরূহ ব্যাপার, সেগুলো দু'ধরনের– এক. আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর অন্তর্নিহিত মর্মার্থ। দুই. ইঙ্গিতসূচক আয়াত ও পূর্ববর্তী রাসূলগণের বিভিন্ন ঘটনাবলী যা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লিখিত হয়েছে, তার গভীর বিশ্লেষণ ও তার অদ্যপান্ত গবেষণায় লিপ্ত না হওয়া। এ ধরনের আরো অন্যান্য আয়াত।

কিন্তু তারপর যখন আরবদের এ প্রজন্ম অতিবাহিত হলো আর অনারব লোকেরা আরব ভূমিতে প্রবেশ করল তখন আরব-অনারব লোকদের ভাষার সংমিশ্রণে মূল কুরআনিক আরবী ভাষা হারিয়ে যেতে বসল। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মর্মার্থ বুঝা দুষ্কর হয়ে উঠল। এতে সাহিত্য ও ব্যাকরণ খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন দেখা দিল। মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নোত্তরের ধারা চালু হয়ে গেল। তাফসীরের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা শুরু হলো। এজন্য আমি প্রয়োজন মনে করলাম যে, কঠিন কঠিন জায়গাগুলো উল্লেখ করে দেই। সাথে সাথে কিছু উদাহরণও উপস্থাপন করি।

১. যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনাকারীদের ধারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। মাঝখানে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েনি। তাকে মারফু হাদীস বলে।

যেন মুফাস্‌সিরগণ এসব জায়গায় চিন্তা-গবেষণা করতে গিয়ে অতিরিক্ত আলোচনার দরকার মনে না করেন। সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা ও মর্মার্থ অনুধাবনে সুদীর্ঘ আলোচনার দিকে ঝুঁকে না পড়েন।

আয়াতের অর্থ বুঝা কঠিন হওয়ার কারণ : যেসব আয়াতের অর্থ বুঝা কঠিন হয় সেগুলো হলো :

১. কখনো বিরল শব্দ ব্যবহারের কারণে তার অর্থ বুঝা কঠিন হয়ে যায়। এর সমাধান হলো– তখন দেখতে হবে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈ এবং সব মুফাস্‌সিরগণ এর কী অর্থ করেছেন। সে অনুযায়ী অর্থ বর্ণনা করা।

২. কখনো নাসিখ-মান্‌সুখ বা রহিতকারী আয়াত ও রহিতকৃত আয়াত সম্পর্কে অল্প ধারণা থাকার কারণে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা হয়।

ওলামার মতে– مَالاَ يُنْبِئُ ظَاهِرُهُ عَنْ مُرَادِهِ . - অর্থাৎ যার প্রকাশ্য শব্দ বিশ্লেষণে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। এখানে এ অর্থই প্রযোজ্য।

এজন্য সাহাবায়ে কিরাম এ ধরনের প্রশ্ন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব কমই করেছেন। আর এ কারণেই এ ধরনের মারফু 'হাদীস' খুবই কম বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

৩. কখনো শানে নুযূলের ব্যাপারে অমনোযোগী হওয়ার কারণে।

৪. কখনো মুযাফ (مضاف) বা মওসুফ (موصوف) বা এ ধরনের শব্দ উহ্য থাকার কারণে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়।

৫. কখনো এক ধরনের শব্দের স্থলে অন্য ধরনের শব্দ ব্যবহারের ফলে দুর্বোধ্যতা তৈরী হয়। যেমন- একটি বিশেষ্যের জায়গায় অন্য বিশেষ্য (اسم), একটি ক্রিয়ার জায়গায় অন্য ক্রিয়া (فعل), একটি অব্যয়ের জায়গায় অন্য অব্যয় (حرف)।

একবচনের জায়গায় বহুবচন, বহুবচনের জায়গায় একবচন, মধ্যম পুরুষের (خطاب) জায়গায় প্রথম পুরুষ/নাম পুরুষ (غائب) ব্যবহার করা, ইত্যাদি।

৬. কখনো শব্দ আগ-পিছ করার কারণে।

৭. কখনো সর্বনাম (ضمير) বিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বা একটি শব্দের একাধিক অর্থ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে।

৮. কখনো একই শব্দ বারবার উল্লেখ করার কারণে বা বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপিত হওয়ার কারণে।

৯. কখনো সংক্ষিপ্ত বর্ণনার কারণে।

১০. কখনো ইশারা (كناية), পরোক্ষ ইঙ্গিত (تعريض), দ্ব্যর্থবোধক (متشابه) ও যুক্তিভিত্তিক রূপক (مجاز عقلى) শব্দ ব্যবহারের ফলে অর্থ- বুঝা কঠিন হয়ে যায়।

সুতরাং যেসব সৌভাগ্যবান ভাইয়েরা তাফসীর বুঝতে আগ্রহী তাদের জন্য প্রথমেই উদাহরণসহ এসব বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা জেনে নেয়া জরুরি। যেন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমুখী জায়গাগুলোতে ইশারা-ইঙ্গিতই তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনের বিরল ব্যবহৃত শব্দাবলীর ব্যাখ্যা

সাহাবা, তাবিঈ এবং আরবী ভাষাবিদ ওলামা থেকে কুরআন মাজীদের এসব বিরল ব্যবহৃত শব্দাবলীর যেসব ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। নির্ভরযোগ্যতার স্তর হিসেবে সেগুলোর মান হলো :

১. সর্বোত্তম ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা হলো- যা বিখ্যাত মুফাস্‌সির সাহাবী

www.pathagar.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) (মৃ-৬৮ হি.) থেকে আলী ইবনে আবী তালহা (র.) (মৃ-১৪৩ হি.)-এর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) (মৃ-২৫৬ হি.) তার সহীহ বুখারী গ্রন্থে এ সনদের উপর নির্ভর করেছেন।

২. দ্বিতীয় স্তরের ব্যাখ্যা হলো– যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম হিলালী (র.) (মৃ-১০৫ হি.)-এর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

৩. খারেজী নেতা নাফে' ইবনে আযরাক (মৃ-৬৫ হি.)-এর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর যেসব ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এটা হলো তৃতীয় স্তরের ব্যাখ্যা।

হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) তার তাফসীরের মূলনীতি গ্রন্থ (اَلْاِتْقَانْ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنْ) আল্ ইতকানে এ তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন।

৪. ইমাম বুখারী (র.) তাফসীরের ইমামগণ (মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা প্রমুখ) থেকে যেসব ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন, এটা চতুর্থ স্তর।

৫. অন্যান্য মুফাস্সিরগণ সাহাবা, তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈন থেকে যেসব ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন সেগুলো সর্বশেষ স্তর।

আমার কাছে উপযোগী মনে হচ্ছে যে, এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে 'শানে নুযূল' সম্পর্কিত আলোচনায় কুরআনের বিরল ব্যবহৃত শব্দগুলোর কিছু ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করব। আর এটাকে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকার আকার দেব। যার ইচ্ছা এর সাথে মিলিয়েও অধ্যয়ন করতে পারে। আর যার ইচ্ছা আলাদা করেও অধ্যয়ন করতে পারে। কারণ একেক জনের পছন্দ একেক রকম হয়ে থাকে।

এখানে একটি কথা জানা থাকা উচিত, সাহাবা ও তাবিঈগণ আভিধানিক অর্থ বাদ দিয়ে অনিবার্য অর্থ দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। আর পরবর্তী মুফাস্সিরগণ এর অনুসরণ করেছেন। তারা অভিধান ঘেঁটেছেন, ব্যবহারের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করেছেন, দেখছেন যে তাদের ব্যাখ্যাই যথার্থ। পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্বসূরিদের ব্যাখ্যাগুলো হুবহু উপস্থাপন করাই আমার উদ্দেশ্য। সেগুলোর যথার্থতা নির্ণয় করা বা সংযোজন-বিয়োজন করার উপযুক্ত স্থান এটি নয়। আসলে সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।

তাফসীর শাস্ত্রে অনেক কঠিন কঠিন অধ্যায় রয়েছে। সেসব ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মাঝে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি অধ্যায় হলো– 'নাসিখ-মানসূখ অধ্যায়'। এখানে সবচেয়ে জটিল ব্যাপার হলো– পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (مُتَقَدِّمِيْنَ وَمُتَاَخِّرِيْنَ) ওলামায়ে কিরামের মতবিরোধ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতে نَسْخٌ এর সংজ্ঞা :

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের বাণীগুলো বিশ্লেষণ করলে যে কথাটি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো– তারা نَسْخٌ শব্দটিকে তার আভিধানিক অর্থেই ব্যবহার করতেন অর্থাৎ– 'কোন বস্তুকে অন্য কোন বস্তু দ্বারা দূর করা।' তাঁরা তাফসীরের মূলনীতিবিদদের অর্থে نَسْخٌ কে বুঝতেন না। তাঁদের মতে نَسْخٌ অর্থ হলো– আয়াতের কোন কোন বিধি-বিধানকে পরে নাযিল কোন আয়াতের বিধানের মাধ্যমে বাতিল করা বা রহিত করা।

চাই তা :

১. আমলের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে হোক বা

২. বাক্যের যে অর্থটি আগে মনে আসে তার পরিবর্তে বাক্যটিকে এমন একটি অর্থে ব্যবহার করার মাধ্যমে হোক যে অর্থটি একটু দেরিতে মনে আসে বা

৩. আয়াতের কোন শর্তকে আকস্মিক সাব্যস্ত করার মাধ্যমে হোক বা

৪. আয়াতের কোন বিধানকে ক্ষেত্র বিশেষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হোক বা

৫. কুরআনের সরাসরি উদ্ধৃতি এবং বাহ্যিকভাবে যা তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে– এ দু'য়ের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনার মাধ্যমে হোক বা

৬. জাহিলী যুগের সংস্কৃতিকে বাতিল করে দিয়ে হোক বা

৭. আগেকার শরীয়তের কোন বিধি-বিধানকে উঠিয়ে নিয়ে হোক।

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতে 'মান্‌সুখ' বা রহিত আয়াতের সংখ্যা

তাঁদের কাছে নাসিখ-মান্‌সুখের ক্ষেত্র সুবিশাল আকার ধারণ করেছে। বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনার জোয়ার দেখা দিয়েছে। ফলে মতবিরোধের ক্ষেত্রও তাদের কাছে বিস্তৃত হয়ে গেছে। আর তাই তাঁদের মতে 'মান্‌সুখ' বা রহিত আয়াতের সংখ্যা পাঁচ শ'তে গিয়ে ঠেকেছে, শুধু তাই নয় বরং গভীর দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, তাদের মতে 'মান্‌সুখ' বা রহিত আয়াতের সংখ্যা অসংখ্য। আর মুতাআখ্‌খিরীন বা পরবর্তী ওলামায়ে কিরামের পরিভাষায় যেহেতু نَسْخٌ বলা হয়– পূর্ববর্তী কোন 'বিধানকে পরবর্তী কোন বিধানের মাধ্যমে বাতিল করা', তাই তাঁদের মতে 'মান্‌সুখ' বা রহিত আয়াতের সংখ্যা খুবই কম। বিশেষত আমরা যে মত গ্রহণ করেছি।

www.pathagar.com

মুতাআখ্খিরীন বা পরবর্তী ওলামাদের মতে 'মান্সুখ' বা রহিত আয়াত

শেখ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) (মৃ- ৯১১ হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ– 'আল্-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' গ্রন্থে 'নস্খ'-এর ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামত স্ববিস্তারে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর শেখ ইবনুল আরাবী (র.) (মৃ– ৫৪৩ হি.) পরবর্তী ওলামাদের মতানুযায়ী একুশটি আয়াত গণনা করেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) বলেন, এই একুশটির অধিকাংশের ব্যাপারে আমার কিছু মতামত আছে। এখন আমি আমার মতামত হাফেয সুয়ূতীর (র.) বক্তব্যসহ উল্লেখ করছি।

সূরা বাকারার ৬টি আয়াত

এক. মহান আল্লাহ বলেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ـ

"তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরি।" (সূরা বাকারা-১৮০)

এ আয়াতটি 'মান্সুখ', এখন কোন্ আয়াতের মাধ্যমে আয়াতটি মান্সুখ হয়েছে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের তিনটি মত পাওয়া যায়।

১. সূরা নিসার (১১-১৪) নম্বর আয়াতে বর্ণিত মীরাস বা উত্তরাধিকারের বিধান সম্বলিত আয়াত হলো 'নাসিখ' বা রহিতকারী আয়াত।

২. আয়াতের হুকুমটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের لَاوَصِيَّةَ لِوَارِث (কোনো ওয়ারিসের জন্য ওসীয়ত করা যায় না) হাদীসখানাই মান্সুখ করেছে অর্থাৎ এখানে 'নাসিখ' বা রহিতকারী হলো, নবীজির এ হাদীস।

৩. ওলামায়ে কিরামের ইজমা' বা ঐকমত্যই আয়াতখানার 'নাসিখ' বা রহিতকারী। শেখ ইবনুল আরাবী (র.) এ মতটি বর্ণনা করেছেন।

আমার মতে [শাহ ওয়ালীউল্লাহর (র.)] বাকারার আয়াতটি সূরা নিসার মীরাসের আয়াতের মাধ্যমেই 'মান্সুখ' হয়েছে এবং নবীজির হাদীসখানা ঐ রহিতকরণকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

www.pathagar.com

দুই. মহান আল্লাহ বলেন : وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ـ

"আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে।" (বাকারা-১৮৪)

হাফেয সুয়ূতী (র.) বলেন– এ আয়াতের ব্যাপারে কোনো কোনো আলিমের মত হলো–

এ আয়াতটি পরবর্তী আয়াত : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ـ

"সুতরাং তোমাদের যারা এ মাস পাবে তারা যেন রোযা রাখে।" (বাকারা-১৮৫) –দ্বারা মান্‌সুখ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় মত হলো, প্রথম আয়াত মান্‌সুখ হয়নি, বরং তা 'মুহ্‌কাম' (محكم) অর্থাৎ আয়াতের বিধান বহাল রয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতটি সুস্থ সবল লোকদের জন্য প্রযোজ্য। আর প্রথম আয়াত অতি বার্ধক্যে উপনীত বৃদ্ধ বা চিররোগী ইত্যকার লোকদের জন্য প্রযোজ্য। আয়াতের শব্দ يُطِيْقُوْنَ ক্রিয়ার পূর্বে لَا অক্ষরটি উহ্য রয়েছে। لَا يُطِيْقُوْنَ অর্থ হলো– যারা সক্ষম নয় বরং অক্ষম।

আমার মতেও [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)] আয়াতটির বিধান বহাল রয়েছে (محكم)। আমার মতে রোযার সাথে প্রথম আয়াতের কোনই সম্পর্ক নেই।

এখানে সদকায়ে ফিত্‌রের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো– "যারা ফিদয়া তথা একজন অভাবগ্রস্তকে ফিতরা দিতে সক্ষম, তাদের কর্তব্য ফিদ্‌য়া বা সদকায়ে ফিত্‌র দান করা।"

আয়াতের মূল শব্দমালা আসলে এমন ছিল :

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَ الطَّعَامَ فِدْيَةٌ هِيَ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ـ

'বিশেষ্য উল্লেখ না করেই 'সর্বনাম' উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে পরের শব্দকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ফিদ্‌য়ার অর্থই হলো– খাবার (طَعَام) আর এখানে ফিদ্‌য়ার মর্মার্থ– 'সদাকাতুল ফিত্‌র।' এর পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রোযার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ আয়াতে সদাকায়ে ফিতরের কথা বলেছেন। পরের আয়াতে ঈদের তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতাও প্রমাণ করে যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সদাকায়ে ফিত্‌রের কথাই বলেছেন।

www.pathagar.com

তিন. আল্লাহ তা'আলা বলেন : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ

"রোয়ার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।" (বাকারা-১৮৭)

শেখ ইবনুল আরাবী (র.) উল্লেখ করেছেন নিম্নের আয়াতটি এ আয়াতের মাধ্যমে মান্‌সুখ হয়ে গেছে।

আয়াতটি হলো–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ

"হে মুমিনেরা! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল।" (বাকারা-১৮৩)

হাফেয সুয়ূতী (র.) বলেছেন প্রথম আয়াতটি নাসিখ বা রহিতকারী। আর দ্বিতীয় আয়াত মান্‌সুখ বা রহিত। কারণ দ্বিতীয় আয়াতে আমাদের রোযাকে পূর্ববর্তী উম্মতদের রোযার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আগেকার উম্মতদের রোযার যেসব বিধি-বিধান ছিল তা আমাদের রোযার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তাদের জন্য যেহেতু রমযানের রাতে ইশার নামায পড়ার পর এবং নিদ্রা যাওয়ার আগ পর্যন্তই পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের অনুমতি ছিল এবং ইশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তা নিষিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় আয়াতের এ নিষেধাজ্ঞা প্রথম আয়াতের অনুমতির মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং দ্বিতীয় আয়াতটি মান্‌সুখ এবং প্রথম আয়াত নাসিখ।

শেখ ইবনুল আরাবী (র.) আরেকটি মত উল্লেখ করেছেন। তা হলো– ইসলামের প্রাথমিক যুগে রমযানের রাতে ইশার নামাযের পর বা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ যে ছিল, তা দ্বিতীয় আয়াতের ভিত্তিতে ছিল না। বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের ভিত্তিতে ছিল। আর ঐ সুন্নাতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিধানকে প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়ে মান্‌সুখ করে দেয়। দ্বিতীয় আয়াতটি মান্‌সুখ হয়নি। বরং তা محكم বা বহাল রয়েছে।

আমার মতে [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)] উভয় মতটিই ভুল। কারণ আমাদের শরীয়তের রোযাকে যে পূর্ববর্তী উম্মতদের রোযার সাথে তুলনা করা হয়েছে তা শুধু ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ– তাদের প্রতি যেমন রোযা ফরয ছিল তেমনি তোমাদের জন্যও রোযা ফরয করা হয়েছে। এখানে অন্যান্য বিধি-বিধানের

www.pathagar.com

কোন সম্পর্ক নেই। রোযার বিধান সম্বলিত প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার আগে সাহাবাদের মধ্যে যা প্রচলিত ছিল, তা এখানে পরিবর্তন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মতটিও ভুল। কারণ আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এমন কোন হাদীসের সন্ধান পাইনি, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায পড়ার পর বা রাতে ঘুমিয়ে যাবার পর পানাহার বা স্ত্রী সহবাস নিষেধ করেছেন। সুতরাং 'এ বিধানটি সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত ছিল' বলা যাবে না।

আর যদিও মেনে নেয়া হয় যে তা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত ছিল। সেক্ষেত্রে সুন্নাতের বিধানই মান্‌সুখ সাব্যস্ত হবে। প্রথম আয়াত কোন অবস্থাতেই মান্‌সুখ হতে পারে না। বরং তা محكم বা বহাল রয়েছে।

চার. মহান আল্লাহ বলেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ، قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ـ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ـ

"সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফুরী করা। মসজিদে হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নর হত্যার চাইতেও মহাপাপ, বস্তুত তারা তো সব সময়ই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। যেন তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়।" (বাকারা-২১৭)

হাফেয সুয়ূতী (র.) বলেন : উপরের আয়াতটির বিধান অর্থাৎ পবিত্র মাসগুলোতে (যিলকদা, যিলহাজ্জাহ, মুহাররম ও রজব) জিহাদ নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশ 'মান্‌সুখ' হয়ে গেছে, কারণ ইবনে জারীর (র.) হযরত আতা ইবনে মাইসারা থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা তওবার- وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً ـ

"তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে।" (তওবা-৩৬) এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর প্রথম আয়াতটি মান্‌সুখ হয়ে যায়।

আমার মতে [শাহ ওয়ালীউল্লাহ র.)] প্রথম আয়াতটি পবিত্র মাসে যুদ্ধ হারাম হওয়া প্রমাণ করে না। বরং বৈধ হওয়াই প্রমাণ করে, আয়াতের অর্থ হলো– পবিত্র মাসগুলোতে যুদ্ধ করা বড় গুনাহ ঠিকই। কিন্তু এ সময়ে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা আরো কঠিন গুনাহ। পবিত্র মাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে অমুসলিমরা যদি ফেতনা-ফাসাদ বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, তখন তাদের মুকাবিলা করা বৈধ হবে। এ ব্যাখ্যা আয়াতের পরবর্তী বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

আমরা এটা মানি যে, এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ গুনাহের কাজ, কিন্তু অমুসলিমদের পক্ষ থেকে এটা মানতে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে প্রতিরোধ সৃষ্টি করাও বৈধ। যেমন আল্লাহ তা'আলা আয়াতের পরবর্তী অংশে তাদের প্রতিবন্ধকতাকে আরো মারাত্মক গুনাহ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের প্রতিবন্ধকতাকে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ বৈধ হওয়ার কারণ নির্ণয় করেছেন।

পাঁচ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

"আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসীয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (বাকারা-২৪০)

হাফেয সুয়ূতী (র.) বলেন– আয়াতের الى الحول অর্থাৎ 'এক বছর পর্যন্ত' অংশটি সূরা বাকারার ২৪৩ নং আয়াতের اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا বা 'চার মাস দশদিন' অংশের মাধ্যমে মান্‌সুখ হয়ে গেছে। ফলে স্ত্রী গর্ভবতী না হলে চার মাস দশদিন পরই অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

মান্‌সুখ হওয়ার আরেকটি দিক হলো– সূরা নিসার-১১-১৪ নং আয়াতে মীরাসের

www.pathagar.com

বিধানে বলা হয়েছে– কোন ওয়ারিসের জন্য ওসীয়ত করা যাবে না, সুতরাং নিসার ঐ আয়াত এ আয়াতকে মান্‌সুখ করে দিয়েছে।

আয়াতের তৃতীয় আরেকটি বিধান হলো– স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার ঘরে বসবাসের অধিকার সংক্রান্ত। ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) সহ একদল আলিমের মতে বসবাসের অধিকার সংক্রান্ত বিধানটি মান্‌সুখ হয়নি, বরং তা বহাল থাকবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.) সহ একদল আলিমের মতে প্রিয় নবীর হাদীস لَا سُكْنٰى (বসবাসের অধিকার নেই) হাদীসের মাধ্যমে তা মান্‌সুখ হয়ে গেছে। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার ঘরে বসবাসের অধিকার পাবে না।

আমার মতে [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)] হাফেয সুয়ূতী (র.) ঠিকই বলেছেন। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের মতে আয়াতের বিধান মান্‌সুখ হয়ে গেছে।

তবে আমার মনে হয় বিধানটিকে মানসুখ বলার প্রয়োজন নেই। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির জন্য তার বিধবা স্ত্রীর পক্ষে তার ঘরে এক বছর বসবাস করা এবং তার খোরপোষের খরচের জন্য ওসীয়ত করা মুস্তাহাব বা জায়েয। কিন্তু বিধবা স্ত্রী এ ওসীয়ত পালনে স্বাধীনা বিবেচিত হবে। সে চাইলে এক বছর পূর্ণও করতে পারে খোরপোষ গ্রহণ করে আর ইচ্ছা করলে চার মাস দশদিন পূর্ণ করে স্বাধীনও হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ চার মাস দশদিন পর সে অন্যত্র চলে যেতে পারে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এটাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত। আর আয়াত থেকে প্রকাশ্যে এটাই বুঝা যায়।

ছয়. মহান আল্লাহ বলেন :

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ـ

"তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নেবেন।" (বাকারা-২৮৪)

হাফেয সুয়ূতী (র.) বলেন– এ আয়াত তার পরের আয়াতের মাধ্যমে মান্‌সুখ হয়ে গেছে। পরের আয়াতটি হলো :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ـ

"আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যের বাইরে।" (বাকারা-২৮৬)

www.pathagar.com

আমার মতে [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)] এখানে রহিত করা না করার কিছুই নেই। প্রথম আয়াতটি মনের সব ধরনের জল্পনা-কল্পনা কথা প্রকাশ করছে। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতটি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, ঐসব জল্পনা-কল্পনার ব্যাপারেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যা তার ইচ্ছাকৃত হবে। কারণ অনিচ্ছায়ও মানুষের মনে অনেক জল্পনা-কল্পনা এসে যায় যা দূর করা তার সাধ্যের বাইরে। এ ব্যাপারটিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছে দ্বিতীয় আয়াত, এখানে প্রথম আয়াতটি সাধারণ বিধান বর্ণনা করেছে। আর দ্বিতীয় আয়াত বিশেষ একটি অবস্থাকে ঐ বিধান বহির্ভূত বলে চিহ্নিত করে দিয়েছে মাত্র।

সূরা আলে ইমরান থেকে ১টি আয়াত

সাত. আল্লাহ তা'আলা বলেন : اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ ـ

"তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর।" (আলে ইমরান-১০২)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন : فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ

"তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর।" (তাগাবুন-১৬)

বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে, দু'টো আয়াতের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। তাই মুফাস্‌সির ওলামায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে ভিন্ন মত সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আয়াত দু'টো যেহেতু বাহ্যিক পরস্পর বিরোধী। তাহলে এখানে কোনো আয়াত কি মান্‌সুখ হয়েছে? মান্‌সুখ হলে কোন্‌টি নাসিখ? আর কোন্‌টি মান্‌সুখ? নাকি আয়াত দু'টোই মুহকাম? হাফেয সুয়ূতী (র.) বলেন– এখানে কয়েকটি মত আছে, একটি মত হলো, প্রথম আয়াতের বিধান দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা মান্‌সুখ হয়ে গেছে। সুতরাং মানুষ আল্লাহকে কতটুকু ভয় করবে, যতটুকু তার সাধ্য আছে। যথার্থভাবে ভয় করা জরুরী নয়। দ্বিতীয় মত হলো আয়াত দু'টোই মুহকাম। আর সূরা আলে ইমরানে এ প্রথম আয়াতটি ছাড়া আর কোন আয়াত নেই যার ব্যাপারে মান্‌সুখ হওয়ার দাবি সঠিক হতে পারে।

আমার মতে [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)] দ্বিতীয় মতটিই সঠিক, আর উভয় আয়াতের সামঞ্জস্যতা এভাবে যে, حَقَّ تُقَاتِهٖ এর সম্পর্ক হলো শির্ক, কুফুর এবং এ'তেকাদী ব্যাপার সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ এ'তেকাদ বা বিশ্বাসগত ব্যাপারে যথার্থ অবস্থানে দাঁড়াতে হবে। এখানে কোনই ছাড় নেই। কিন্তু আমলের ব্যাপারটি

www.pathagar.com

সাধ্যের সাথে সম্পৃক্ত, যা দ্বিতীয় আয়াতের উদ্দেশ্য। যেমন– অযু করতে সক্ষম না হলে তায়াম্মুম করবে। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম সে বসে নামায আদায় করবে।

প্রথম আয়াতের পরের অংশ– وَلَاتَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ

"তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" – দ্বারা এ ব্যাখ্যারই সমর্থন পাওয়া যায়। মোটকথা মানুষ শিরক ও কুফর থেকে যথার্থভাবে বেঁচে সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে থাকবে।

সূরা নিসা থেকে ৩টি আয়াত

আট. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْدًا ـ

"আর তোমরা যাদের সাথে অঙ্গিকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ সব ব্যাপারে প্রত্যক্ষকারী।" (সূরা নিসা-৩৩)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ ـ

"আর আল্লাহর বিধানে আত্মীয়রা একে অন্যের তুলনায় অধিক হকদার।" (সূরা আনফাল-৭৫; সূরা আহযাব-৬)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– প্রথম আয়াতটি দ্বিতীয় আয়াতের মাধ্যমে মান্‌সুখ হয়ে গেছে সুতরাং যারা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল তারা উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাবে না। শুধু আত্মীয়রাই পাবে।

আমার মতে প্রথম আয়াতের উদ্দেশ্য হলো সৎ ব্যবহার করা অর্থাৎ যাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার হয়েছে, তাদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে আত্মীয়-স্বজনদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রথম আয়াত সদাচরণ সংক্রান্ত আর দ্বিতীয় আয়াত মীরাস সংক্রান্ত। সুতরাং প্রথম আয়াত মান্‌সুখ হয়নি।[১]

১. সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই পরিবার ছেড়ে একাকি মুসলমান হয়ে ছিলেন। তাদের একজনকে অন্য একজনের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরী করেছেন। তারা দু'জন একজন

www.pathagar.com

নয়. মহান আল্লাহ বলেন :

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا۔

উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের সময় সম্পদের ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন এসে উপস্থিত হলে, তাদেরকে তা থেকে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে। (নিসা-৮)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– একদল ওলামার মতে আয়াতটি মান্‌সুখ হয়ে গেছে। কিন্তু অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম বলেন– আয়াতটির বিধান বহাল রয়েছে (محكم)। কিন্তু মানুষ এটা আমল করতে অনীহা প্রদর্শন করে থাকে। আমার বক্তব্য [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)], হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– আয়াতটি মুহকাম।

অর্থাৎ এর বিধান বহাল রয়েছে। আর এখানে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা আমল করা মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। (বুখারী-৩৮৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতটিই অধিক স্পষ্ট।

দশ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالّٰتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۔ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً ۔ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا۔

"আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে ঘরে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। তোমাদের

অপরজনের ওয়ারিস হতো। পরে তখন তাদের আত্মীয়-স্বজনরা মুসলমান হতে শুরু করে। তখন দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয়। ফলে তাদের নিজেদের অঙ্গীকারাবদ্ধ ভাইদের সাথে সদাচরণ করতে বলা হয় এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিশ্চিত করা হয়। (তাফসীরে উসমানী-১-৩৮৯)

www.pathagar.com

মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর।" (নিসা-১৫-১৬)

আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরে ইরশাদ করেন :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاَةَ جَلْدَةٍ ـ

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী প্রত্যেককে একশো করে বেত্রাঘাত কর।" (সূরা নূর-২)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– প্রথম আয়াতটি দ্বিতীয় আয়াতের মাধ্যমে রহিত (منسوخ) হয়ে গেছে। সুতরাং উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে ব্যভিচার প্রমাণিত হলে মহিলাদেরকে আজীবন গৃহবন্দী করা এবং পুরুষদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের বিধান এখন আর কার্যকরী হবে না। কার্যকরী বিধান হলো– অবিবাহিত নারী-পুরুষকে একশো বেত্রাঘাত আর বিবাহিত নারী-পুরুষকে পাথরের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান।

আমার মতে [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)] এখানে প্রথম আয়াতটি মান্‌সুখ নয়। পরিপূর্ণ বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত তা কার্যকর ছিল এবং এ আয়াতেই পরিপূর্ণ বিধানের ওয়াদা করা হয়েছে। যখন পরিপূর্ণ বিধান অর্থাৎ বিবাহিতদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা এবং অবিবাহিতদের জন্য একশো বেত্রাঘাত সংক্রান্ত আইন অবতীর্ণ হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে দেন যে এটাই ওয়াদাকৃত আল্লাহর বিধান। সুতরাং প্রথম আয়াতের শাস্তিটি সাময়িক ছিল। এটা কোন 'শরয়ী হদ্ বা 'ইসলামী শাস্তি বিধান' ছিল না। সুতরাং প্রথম আয়াতকে 'মান্‌সুখ' আর দ্বিতীয় আয়াতকে 'নাসিখ' বলা ঠিক হবে না।

সূরা মায়িদা থেকে ৩টি আয়াত :

এগার.

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ.

"হে মুমিনেরা! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ[১] ও পবিত্র মাসসমূহের অবমাননা করো না।" (সূরা মায়িদা-২)

---

১. 'শা'আইরাল্লাহ' বলতে পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফ, সাফা-মারওয়া, জামারাত, কুরবানীর পশু, পৃথিবীর সব মসজিদ, সব আসমানী কিতাব এবং দ্বীনের সব বিধি-বিধান বুঝায়।

www.pathagar.com

আবার অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ.

"মুশরিকদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে।" (সূরা তওবা-৫)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– দ্বিতীয় আয়াতে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে প্রথম আয়াতের وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ কে মান্‌সুখ করা হয়েছে।

আমার মতে [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)] প্রথম আয়াতের বিধান রহিত হয়নি। কুরআন মাজীদ ও হাদীসে রাসূলে আমি এর কোন রহিতকারী উদ্ধৃতি খুঁজে পাই না, এ মাসে জিহাদ করলেই যে মাসগুলোর অবমাননা হবে এমনটি নয়। এ মাসগুলোতে মুসলমানরা নিজে থেকে জিহাদ পরিচালনা করবে না। তবে কাফের মুশরিকরা যদি এ মাসে আক্রমণ করে বসে তবে তার প্রতিরোধ করবে অবশ্যই। কোন অবৈধ যুদ্ধ এ সময়ে করবে না, যেমন মুসলমানদের পারস্পরিক মারামারি ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি। আর এ মাসগুলোতে গুনাহ ও অবৈধ কাজ বর্জন করা। এগুলো অন্য মাসের তুলনায় এ মাসে বেশি জঘন্য। এ আয়াতে এ ধরনের অবৈধ যুদ্ধ ইত্যাদি বর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন বিদায় হজ্জের ভাষণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারস্পরিক মারামারি-কাটাকাটির জঘন্যতা বর্ণনা করে ঘোষণা করেন :

اِنَّ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا ـ

"তোমাদের এ দিনটি, তোমাদের এ মাসটি এবং তোমাদের এ শহরটি যেমন পবিত্র তোমাদের জান-মালও ঠিক তেমনি পবিত্র।" (বুখারী-১-২৩৪) সুতরাং وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ -এর সম্পর্ক জিহাদের সাথে নয়।

বার.

মহান আল্লাহ বলেন :

فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا۔

"অতএব তারা (ইহুদী) যদি আপনার কাছে আসে তবে হয় তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদেরকে এড়িয়ে যান। যদি তাদের থেকে এড়িয়ে যান, তাহলে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে।" (মায়িদা-৪২)

অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ ـ

"তাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফয়সালা কর। তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।" (মায়িদা-৪৯)

শেখ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন– দ্বিতীয় আয়াতের মাধ্যমে প্রথম আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং কিতাবধারী ইহুদী খৃষ্টানরা যদি ইসলামী আদালতে কোন বিচার দায়ের করে তাহলে ইসলামী আদালতের বিচারপতি তাদের দায়েরকৃত মুকাদ্দামা এড়িয়ে যেতে পারবেন না। তাঁকে অবশ্যই কুরআন হাদীস অনুযায়ী তাদের ফয়সালা করতে হবে।

আমার মতে প্রথম আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়নি, দু'টো আয়াতই বহাল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন, যদি বিচার করতে চাও তাহলে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার কর। তাদের খেয়াল খুশির তোয়াক্কা করতে পারবে না। মোটকথা, আমাদের বিচারকদের এ অধিকার আছে, তারা চাইলে যিম্মিদের (সংখ্যালঘু) বিচার এড়িয়ে যেতে পারেন। আর তারা তাদের বিচারকদের আদালতে বিচার দায়ের করতে পারে। তখন তাদের বিচারক তাদের ধর্মানুযায়ী ফয়সালা করবে। আর আমাদের বিচারক বিচার করলে তাদের ধর্মানুযায়ী বিচার করতে পারবেন না। বরং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার করতে হবে।

তের.

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ـ

"হে মুমিনেরা! তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ণ দু'জনকে সাক্ষী রাখ। অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের মধ্য থেকে দু'জন।" (মায়িদা-১০৬)

অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ ـ

www.pathagar.com

"এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী বানাও।" (সূরা তলাক-২)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– প্রথম আয়াতের বিধান দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং মুসলমানরা যদি কোন অমুসলিম লোককে সাক্ষী বানায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। মুসলমান মুসলমানকেই সাক্ষী বানাতে পারবে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র.) এ মতই ব্যক্ত করেছেন।

আমার বক্তব্য হলো [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)]– ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) আয়াতের বাহ্যিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে 'তোমাদের ছাড়া অন্য লোক' দ্বারা 'অমুসলিমই' বুঝেছেন।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় মত হলো– 'তোমাদের ছাড়া অন্য লোক' বলতে তোমাদের নিকটাত্মীয় ছাড়া অন্য মুসলমান। সুতরাং দু'টো আয়াতই বহাল রয়েছে। এখানে কোন বিরোধ নেই।

সূরা আনফাল থেকে ১টি আয়াত :

চৌদ্দ.

মহান আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِاَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِاَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَفْقَهُوْنَ ـ

"হে নবী! আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করুন জিহাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শোর মুকাবিলায় আর যদি তোমাদের মধ্যে একশো লোক থাকে, তাহলে হাজার কাফেরের উপর জয়ী হবে। কারণ তারা জ্ঞানহীন।" (আনফাল-৬৫)

পরের আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِاَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِاَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

www.pathagar.com

"এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি ধৈর্যশীল একশো লোক বর্তমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শোর উপর। আর যদি তোমার এক হাজার হও, তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজার-এর উপর। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (আনফাল-৬৬)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– দ্বিতীয় আয়াতের মাধ্যমে প্রথম আয়াতের বিধান মান্‌সুখ হয়ে গেছে। সুতরাং কাফেরের সংখ্যা যদি মুসলমানদের দ্বিগুনের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জরুরি নয়।

আমার [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)] মতও একই। প্রথম আয়াতটি মান্‌সুখ।[১]

সূরা বারাআত থেকে ১টি আয়াত :

পনের.

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প হোক বা প্রচুর সরঞ্জাম নিয়ে জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা তওবা-৪১)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– নীচে উল্লিখিত ওজর সম্পর্কিত তিনটি আয়াতের মাধ্যমে মান্‌সুখ হয়ে গেছে।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ ـ وَلاَ عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ـ

"অন্ধের জন্য (জিহাদে অংশ না নিলে) কোন অসুবিধা নেই। খোঁড়ার জন্যও কোন অসুবিধা নেই। আর অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও কোন অসুবিধা নেই।" (সূরা ফাতাহ্-১৭)

---

১. এখানে আয়াতে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, আসলে দ্বিতীয় আয়াতে দুর্বলদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। আর প্রথম আয়াতটি দৃঢ়চিত্ত বীর মানুষের অধিকারীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। মুতার যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তিন হাজার আর কাফের বাহিনী ছিল তিন লাখ। সুতরাং পরবর্তী ওলামাদের মতে এটাকে 'রহিতকরণ' না বলে 'তাখফীফ' বা সহজকরণ বলা উচিত।'

www.pathagar.com

২. অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضٰى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ مَايُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ لا

وَّلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ص تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلاَّ يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ط

"দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অক্ষম লোকদের (জিহাদে অংশ না নিলে) কোন অসুবিধা নেই। যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে, নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ তো ক্ষমাকারী দয়ালু। আর তাদেরও কোন অসুবিধা নেই, যারা তোমার কাছে এসেছে যেন তুমি তাদেরকে বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ– আমার কাছে এমন কোন কিছু নেই, যার উপর তোমাদের সোয়ার করাব, তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন কিছু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে।" (সূরা তাওবা-৯১-৯২)

৩. অন্যত্র ইরশাদ করেন : وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ـ

"মুমিনদের সকলে এক সাথে (জিহাদে) বেরিয়ে যাওয়া উচিত নয়।" (সূরা তওবা-১১২)

হাফেয সুয়ূতী (র.) বলেন– আয়াতে ثِقَالاً দ্বারা সবল-সুস্থ ও সচ্ছল লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর خِفَافًا দ্বারা দুর্বল, অসুস্থ ও অসচ্ছল লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ দুর্বল হোক বা সবল, সুস্থ হোক বা অসুস্থ, সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল সবাইকেই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু পরবর্তী তিনটি আয়াতে অসুস্থ ও দুর্বলদেরকে জিহাদে অংশ না নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রথম আয়াতের বিধান মান্‌সুখ বলে বিবেচিত হবে।

আমার মতে [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)]। ثِقَالاً অর্থ প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধ সরঞ্জাম। আর خِفَافًا অর্থ ন্যূনতম যুদ্ধ সরঞ্জাম অর্থাৎ তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম নিঁয়ে হোক বা ন্যূনতম যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে হোক জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়।

www.pathagar.com

সুতরাং প্রথম আয়াত এবং পরবর্তী তিনটি আয়াতের মর্মার্থে কোন স্ববিরোধিতা নেই। তাহলে কোন আয়াত মান্‌সুখ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। সবগুলো আয়াতের বিধানই বহাল থাকবে। অথবা বলব– যদি ধরেও নেয়া হয় যে হাফেয সুয়ূতীর ব্যাখ্যানুযায়ী خِفَافًا দ্বারা দুর্বল অসুস্থ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, তবুও প্রথম আয়াতটি মান্‌সুখ হওয়া সুনিশ্চিত নয়। কেননা কোন আয়াত মান্‌সুখ হওয়া তখনই সুনিশ্চিত হয় যখন তার বিধান শরীয়তের নির্দেশ হিসেবে বহাল থাকে না অথচ শরীয়াতের বিধান হলো– যখন কোন কাফের বাহিনী ইসলামী রাষ্ট্র আক্রমণ করে বসে তখন সুস্থ-অসুস্থ, যুবক-বৃদ্ধ সবার উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়। এটা সর্বসম্মত মত। সুতরাং আল্লামা সুয়ূতীর ব্যাখ্যা মেনে নিলেও প্রথম আয়াতের বিধান 'সর্বাবস্থায় রহিত হয়ে গেছে' এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

সূরা নূর থেকে ২টি আয়াত :

ষোল.

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَلزَّانِىْ لَايَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"ব্যভিচারী পুরুষ শুধু ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে শুধু ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।"

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে এ আয়াতটি মান্‌সুখ হয়ে গেছে। যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন (যে নারীর স্বামী নেই বা যে পুরুষের স্ত্রী নেই বা বিধবা) তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও, তারা যদি নিঃস্ব হয়। তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।" (সূরা নূর-৩২)

www.pathagar.com

প্রথম আয়াতের حُرِّمَ ذَالِكَ (হারাম করা হয়েছে) সচ্চরিত্রবান পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলার বিবাহ অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে– ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী নারীকে বিবাহ করবে আর ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষকে বিবাহ করবে।

প্রথম এ আয়াতটি দ্বিতীয় আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। কেননা দ্বিতীয় আয়াতে কোন রকমের শর্তারোপ করা হয়নি। সুতরাং সচ্চরিত্রবান পুরুষ বা মহিলা ব্যভিচারী পুরুষ বা মহিলাকে বিবাহ করতে পারে। তা বৈধ।

আমার বক্তব্য হলো– ইমাম আহমদ (র.) আয়াতের উপরে বর্ণিত অর্থই বুঝেছেন। (তিনি দ্বিতীয় আয়াতের মাধ্যমে প্রথম আয়াতকে মান্‌সুখ না বললেও সচ্চরিত্রবান পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ বলেন না।) আর অন্যান্য ইমামগণ حُرِّمَ ذَالِكَ (তা হারাম করা হয়েছে)-এর অর্থ করেছেন– 'ব্যভিচার' 'শিরক। এখানে বলা হয়েছে, ব্যভিচার ও শিরক হারাম। হারামের সম্পর্ক– ব্যভিচার পুরুষ মহিলার সাথে নয়। এ তিন ইমামের মতে ৪ আয়াতের বিবাহের ক্ষেত্রে 'কুফু' বা চারিত্রিক সামঞ্জস্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে সচ্চরিত্রবান পুরুষ ও মহিলার জন্য ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলাকে বিয়ে করা উত্তম নয়। এখানে অবৈধতা বর্ণনা করা হয়নি। তাই দুই আয়াতের মধ্যে স্ববিরোধিতা নেই এবং প্রথম আয়াতের বিধানও মান্‌সুখ হয়নি। আর আল্লামা সুয়ূতী (র.) حُرِّمَ ذَالِكَ-এর সম্পর্ক বলেছেন ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলার সাথে ব্যভিচার আর শিরকের সাথে নয়। এ অর্থ গ্রহণ করলেও প্রথম আয়াতের বিধান মান্‌সুখ বলে প্রমাণিত হয় না। কারণ দ্বিতীয় আয়াতে বিবাহের সাধারণ ও ব্যাপক বিধান বলা হয়েছে। সেখানে শুধু অবিবাহিতদেরকে বিয়ে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর প্রথম আয়াতে বিবাহের ক্ষেত্রে কি কি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং তখনও আয়াত দু'টিতে কোন স্ববিরোধিতা নেই।

সত্তের.

মহান আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ـ لَيْسَ

www.pathagar.com

عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ، كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ، وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

"হে মুমিনেরা! তোমাদের দাস দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং ইশার নামাযের পর। এ তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়, এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোন অসুবিধা নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নূর-৫৮)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– অনেক ওলামায়ে কিরাম এ আয়াতকে মান্‌সুখ বলেছেন, কারণ সাধারণ মানুষ এর ওপর আমল করছে না। সুতরাং এর বিধানটি মান্‌সুখ। অন্য আরেক দল ওলামার মতে এর বিধান মান্‌সুখ হয়নি বরং আয়াতটি মুহকাম, এর বিধান বহাল রয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ এর ওপর অবহেলাবশত আমল করছে না। আমার বক্তব্য হলো– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আয়াতটিকে মুহকাম বলেছেন, এর বিধান বহাল রয়েছে। নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে তাঁর মতই উত্তম।

সূরা আহযাব থেকে ১টি আয়াত :

আঠার.

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ، وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ رَّقِيْبًا ـ

"এরপর আপনার জন্য কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয়। যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে। তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন।" (আহযাব-৫২)

দু'টো আয়াতে পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَالَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ

www.pathagar.com

يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ق خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীদেরকে হালাল করেছি। যাদেরকে আপনি মোহর প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি। যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ত করে দিয়েছেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি, আপনার চাচাত ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি ও খালাতো ভগ্নি। যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য, অন্য মুমিনের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের জন্য। মুমিনদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি তা আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (আহযাব-৫০)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– দ্বিতীয় আয়াতের মাধ্যমে প্রথম আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং প্রথমে নবীজির যেসব স্ত্রী ছিলেন তাদের ছাড়াও অন্যদেরকে বিবাহ করা বৈধ হয়ে যায়।

আমার মতে [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)] আয়াতের ধারাবাহিকতার দিক থেকে নাসিখ আয়াত আগে আসা এবং মান্‌সুখ আয়াত পরে আসাধ্য অসম্ভব নয়। যেমন এখানে হয়েছে, সুতরাং প্রথম আয়াতটি মান্‌সুখ দ্বিতীয় আয়াতের মাধ্যমে মান্‌সুখ হওয়াটা সুস্পষ্ট।

সূরা মুজাদালা থেকে ১টি আয়াত :

উনিশ.

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً، ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ، فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

www.pathagar.com

"হে মুমিনেরা! তোমরা যখন রাসূলের সাথে একাগ্রতায় কথা বলতে চাও। তখন কথা বলার আগে কিছু দান-সদাকা কর। এটা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বেশি পবিত্রতার ব্যাপার। যদি তোমরা তা করতে না পার। তাহলে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (মুজাদালা-১২)

এরপরের আয়াতেই ইরশাদ হয়েছে :

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ، فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ، وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

তোমরা কি কানে কানে কথা বলার পূর্বে সদাকা প্রদান করার কথা বলাতে ভয় পেয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা যখন সদাকা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।" (মুজাদালা-১৩)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– প্রথম আয়াতটি দ্বিতীয় আয়াতের মাধ্যমে মান্‌সুখ হয়ে গেছে। আমার মতেও [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)] প্রথম আয়াতের বিধান মান্‌সুখ হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় আয়াতের বিধান বহাল রয়েছে।

সূরা মুমতাহিনা থেকে ১টি আয়াত :

বিশ.

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ-

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ হাত ছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে থেকে যায় অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী হাত ছাড়া হয়েছে তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ।" (মুমতাহিনা-১১)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– এ আয়াতটি মান্‌সুখ না কি মান্‌সুখ নয়? এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

কয়েকটি মত রয়েছে। একটি মত হলো– আয়াতটি তরবারীর আয়াত :

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً ـ

"তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর।" (তওবা-৩৬)-এর মাধ্যমে মান্‌সুখ হয়ে গেছে। এ মতটি যারা পোষণ করেন, তারা বলেন– عَاقَبْتُمْ অর্থ হলো শাস্তি দেয়া বা পালা, আয়াতের অর্থ হবে 'তারপর যদি তোমাদের শাস্তি দেয়ার পালা আসে।' তরবারীর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে নির্দেশ ছিল, মুহাজির মহিলাদের প্রাপ্য মোহর থেকে মক্কায় স্ত্রী রেখে আসা মুহাজির সাহাবীদের অধিকার আদায় করে দেয়া হবে, কিন্তু তরবারীর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কাফিরের স্ত্রী মুসলমান হয়ে মদীনায় আসার অপেক্ষা করার দরকার আর থাকেনি। বলপ্রয়োগে কাফিরদের থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আরেকটি মত হলো– সূরা আনফালের গনীমতের আয়াত :

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ ـ

দ্বারা মান্‌সুখ হয়ে গেছে। এ মত যারা পোষণ করেন। তাদের মতে عَاقَبْتُمْ-এর অর্থ হলো– (গনীমতের মাল অর্জন করেছ)। গনীমতের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বিধান ছিল, যাদের স্ত্রী মক্কায় রয়ে গেছে তাদের মুহাজির স্বামীদেরকে গনীমতের মাল থেকে কিছু অংশ দিয়ে দিবে। কিন্তু واعلموا انما غنمتم আয়াতে গনীমতের প্রাপকদের যে লিষ্ট দেয়া হয়েছে তাতে মুসলমান স্বামীর নাম নেই। সুতরাং গনীমতের মাল থেকে তাদের অধিকার মান্‌সুখ হয়ে গেছে।

আরেকটি হলো– আয়াতটি বিধান মান্‌সুখ হয়নি। বরং বহালই রয়েছে। এ মত যারা পোষণ করেছেন তারা عَاقَبْتُمْ-এর প্রথম ব্যাখ্যা গ্রহণকারী। তাঁদের মতে আয়াতটি শুধু জিহাদেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে قاتلوا المشركين كافةً মুহাজির মুসলমান স্বামীর মোহরের বিনিময় আদায়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

আমার মতে [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)] প্রথম আয়াতটি মুহকাম। এর বিধান রহিত হয়নি বরং এখনো বহাল রয়েছে। তবে এ বিধান সর্বাবস্থায় প্রয়োগ যোগ্য নয়। বরং বিধান ঐ অবস্থায় প্রয়োগ করা হবে, যখন কাফিরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি থাকে এবং মুসলমানরা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকে। তখনই এ বিধান প্রয়োগ করা হবে।

সূরা মুয্‌যাম্মিল ১টি আয়াত :

www.pathagar.com

একুশ.

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً ـ

"হে বস্ত্রাবৃত! রাত জাগ, কিছু অংশ ছাড়া। অর্ধেক রাত বা তার চেয়ে কম বা তার চেয়ে বেশি। আর কুরআন তিলাওয়াত কর ধীরে ধীরে এবং স্পষ্টভাবে।" (মুয্যাম্মিল-১-৪)

এ সূরারই শেষের দিকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ، وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ، عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

"আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি রাতের দু-তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং আপনার সংগীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ দিন রাতের পরিমাণ জানেন। তিনি জানেন তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। সুতরাং যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ হয়, কুরআনের ততটুকু তোমরা তিলাওয়াত কর।" (সূরা মুয্যাম্মিল-২০)

হাফেয সুয়ূতী (র.) বলেন– তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে রাত জাগার ফরয নির্দেশ সম্পর্কিত প্রথম আয়াত দ্বিতীয় আয়াতের মাধ্যমে মান্সুখ হয়ে গেছে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের হুকুম মান্সুখ হলেও তাহাজ্জুদের নামায ফরয রয়ে গিয়েছিল। পরে যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয় তখন তাহাজ্জুদের ফরযও মান্সুখ হয়ে যায়।

আমার মতে [শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)] পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার মাধ্যমে তাহাজ্জুদের ফরয মান্সুখ হওয়ার দাবি ঠিক নয়। আসলে আয়াতগুলোতে তাহাজ্জুদের নামায মুস্তাহাব হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, প্রথম আয়াতে মুস্তাহাবকে জোর দিয়ে পালনের জন্য বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে ঐ জোরদানকে মান্সুখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লামা সুয়ূতী (র.) (মৃ-৯১১ হি.) শেখ ইবনুল আরাবীর (র.) (মৃ-৫৪৩ হি.) মত সমর্থন করেই বলেন- এ একুশটি আয়াতের বিধান রহিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে কয়েকটি আয়াতের ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মতবিরোধ রয়েছে। নয় নম্বর ও সতের নম্বর আয়াতের ব্যাপারে সঠিক মত হলো যে, এ আয়াত দু'টো মান্‌সুখ হয়নি। বরং তার বিধান বহাল রয়েছে। সুতরাং রহিত আয়াত হলো উনিশটি। কিন্তু আমার মতে এক নম্বর, পাঁচ নম্বর, চৌদ্দ নম্বর, আঠার নম্বর এবং উনিশ নম্বর– এ পাঁচটি আয়াতের ব্যাপারেই রহিত হওয়ার দাবি সঠিক বিবেচিত হতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শানে নুযূল পরিচিতি

শানে নুযূলের ব্যাপারটিও কঠিন একটি ব্যাপার। আর তার কারণও একটাই, তা হলো পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কিরামের মধ্যে পরিভাষার পার্থক্য। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম শানে নুযূল বলতে এক অর্থ বুঝতেন আর পরবর্তীরা অন্য অর্থে তা ব্যবহার করতে থাকেন। ফলে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি আসলেই আয়াতের শানে নুযূল কিনা তা ঠিক করাটা জটিল হয়ে পড়ে।

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের ভাষায় : نَزَلَتْ فِىْ كَذَا-এর অর্থ–

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও তাবিঈন হযরত (র.)-এর বক্তব্য থেকে যে ব্যাপারটি স্পষ্ট বুঝা যায় তা হলো, তাঁরা نَزَلَتْ فِىْ كَذَا (আয়াতটি অমুক ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে) বাক্যটিকে আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে শুধু এমন ঘটনার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতেন না, যে ঘটনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সংঘটিত হয়েছে।

তাঁরা কখনো নবীর যুগে সংঘটিত ঘটনার ক্ষেত্রে বা কখনো নবীর ইন্তেকালের পর সংঘটিত ঘটনার ক্ষেত্রেও نزلت فى كذا বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। এখানে আয়াতে উল্লিখিত সবগুলো কথা পুরোপুরি মিলে যাওয়া শর্ত নয়। বরং মূল বক্তব্যটি মিললেই হলো।

আবার কখনো তারা নবীজিকে প্রশ্ন করা হয়েছে এমন প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন বা এমন কোন ঘটনা, যা নববী যুগে ঘটেছে আর প্রিয়নবী তার বিধান কোন আয়াত মন্থন করে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন– এসব ক্ষেত্রেও সাহাবায়ে কিরাম ও

www.pathagar.com

তাবিঈন فَنَزَلَتْ বা فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَوْلَهُ كَذَا কখনো نَزَلَتْ فِىْ كَذَا বাক্যগুলো ব্যবহার করেছেন।

এখানে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আয়াত থেকে প্রশ্নের উত্তর ও ঘটনার বিধান প্রিয় নবীরই আহরিত। ঐ সময় তার পবিত্র অন্তরে আয়াতটি উদিত হওয়াও এক ধরনের ওহী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে فَأَنْزَلَتْ বলা সম্ভব। এখানে কেউ যদি আয়াতটি দ্বিতীয়বার নাযিল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করে তবে তারও সুযোগ আছে।

হাদীসের যেসব বর্ণনার সাথে শানে নুযূলের সম্পর্ক নেই

হাদীস বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম হাদীসের কিতাবে তাফসীর অধ্যায়ে কুরআন মাজীদের আয়াতের ব্যাপারে যেসব তথ্যাবলী উল্লেখ করেছেন তার অধিকাংশই আসলে শানে নুযূল নয়।

যেমন–

এক. যেসব হাদীসে সাহাবায়ে কিরাম পরস্পর মতবিরোধপূর্ণ ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে বা উদাহরণ হিসেবে কোন আয়াত পেশ করেছেন, এগুলো আসলে শানে নুযূল নয়।

দুই. যেসব হাদীসে প্রিয়নবী তাঁর বাণীর প্রমাণ হিসেবে কোন আয়াত পেশ করেছেন।

তিন. যেসব হাদীসে আয়াতের আলোচনার অনুরূপ আলোচনা করা হয়েছে ঐসব হাদীসে এমন আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ হাদীসটি আসলে শানে নুযূল নয়।

চার. যেসব হাদীসে আয়াত নাযিল হওয়ার জায়গার নাম উল্লিখিত হয়েছে।

পাঁচ. কোন কোন আয়াতে কারো নাম অস্পষ্ট আছে, যেসব হাদীসে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ছয়. যেসব হাদীসের মাধ্যমে কুরআন মাজীদের কোন শব্দের উচ্চারণ পদ্ধতি জানা যায়।

সাত. যেসব হাদীসের মাধ্যমে কোন সূরা বা আয়াতের ফযীলত জানা যায়।

আট. যেসব হাদীসে কুরআনের কোন নির্দেশ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে পালন করেন তা উল্লিখিত হয়েছে

এসব বর্ণনার সাথে আসলে শানে নুযূলের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং কোন মুফাস্‌সিরের জন্য এসব বর্ণনা সম্পর্কে অবহিত (শানে নুযূলের ক্ষেত্রে) হওয়া জরুরি নয়। তবে এসব জ্ঞান লাভ করা উত্তম তো বটেই।

www.pathagar.com

শানে নুযূলের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরের জন্য জরুরী

মুফাস্‌সির আলিমের জন্য দু'টো ব্যাপার জরুরি।

এক. আয়াতে যেসব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে তা জানা। কেননা এসব ঘটনা না জানলে আয়াতের ইঙ্গিত ভাল করে বুঝা সম্ভব হবে না।

দুই. যেসব ঘটনা ও শানে নুযূল প্রমাণ করে যে, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়। যেসব ঘটনা জানা জরুরি, যেমন– কোন আয়াতের একটি ব্যাপারে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ঘটনা প্রমাণ করে আয়াতে ব্যাপক কথা বলা হলেও লক্ষ্য কিন্তু সীমিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রযোজ্য।

আহলে কিতাবদের বর্ণনা থেকে নবীগণের কাহিনীর উপকরণ গ্রহণ করা

হাদীস শরীফে পূর্ববর্তী নবীগণের কাহিনী খুব কমই বর্ণিত হয়েছে। মুফাস্‌সির ওলামায়ে কিরাম লম্বা-চওড়া যেসব কাহিনী বর্ণনা করে থাকেন তার অধিকাংশই আহলে কিতাব ধর্ম যাজকদের থেকে নেয়া। বুখারী শরীফে একটি মারফু হাদীসে প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেন :

لَاتُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَاتُكَذِّبُوْهُمْ ـ

'তোমরা আহলে কিতাবদেরকে সত্যবাদীও বলো না মিথ্যাবাদীও বলো না।' সুতরাং ঐসব বর্ণনা বর্জন করা উচিত।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈ কখনো মুশরিক ও ইহুদীদের ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন। তাদের মধ্যে প্রচলিত জাহিলী সংস্কৃতির কথা তুলে ধরতেন। যেন তাদের আকীদাহ-বিশ্বাস এবং কুসংস্কার সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এসব বর্ণনা করার পর কোন আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং বলতেন– نَزَلَتِ الْاٰيَةُ فِىْ كَذَا (আয়াতটি এ ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে)। এখানে তাদের نَزَلَتِ الْاٰيَةُ فِىْ كَذَا বলার উদ্দেশ্য হতো আয়াতটি এ ধরনের ঘটনার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। চাই যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে ঠিক সে ঘটনাই হোক বা তার মত অন্য কোন ঘটনা হোক বা এর কাছাকাছি ধরনের কোন ঘটনা হোক। মূলত তখন তাদের উদ্দেশ্য হতো ইহুদী মুশরিকদের আকীদাহ-বিশ্বাস ও জাহিলী কুসংস্কারের কথা প্রকাশ করা। মূল ঘটনা বলা উদ্দেশ্য হতো না। বরং তাঁরা ইহুদী মুশরিকদের সঠিক অবস্থার একটা চিত্র তুলে ধরতে চাইতেন। এ জন্যেই অনেক জায়গায় শানে নুযূলের ব্যাপারে তাঁদের পরস্পর বিরোধী মতামত দৃশ্যত মনে হয়। আসলে কিন্তু শানে নুযূলের ব্যাপারে কোন পরস্পর বিরোধিতা

www.pathagar.com

নেই। কেননা তারা যেসব ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন সবক্ষেত্রে শানে নুযূলকে উদ্দেশ্য করেই বর্ণনা করতেন না। বরং ইহুদী মুশরিকদের অপসংস্কৃতির সঠিক এক চিত্র প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য হতো।

হযরত আবু দারদা (রা.) এ দিকেই ইংগিত করেই বলেছেন :

لاَ يَكُوْنُ الرَّجُلُ فَقِيْهًا حَتّٰى يَعْمِلَ الْاٰيَةَ الْوَاحِدَةَ عَلٰى مَعَامِلَ مُتَعَدِّدَةٍ.

'একটি আয়াতকে বহুক্ষেত্রে প্রয়োগ করার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে কেউ ফকীহ (ফিকাহ বিশেষজ্ঞ) হতে পারবে না।' (তাবাকাতে ইবনে সা'দ)

কিছু আয়াত যার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা নেই

তেমনি পবিত্র কুরআনে অনেক জায়গায় দু'টো অবস্থা উল্লিখিত হয়েছে। সৌভাগ্যবানদের পরিচয়, তাতে তাদের কিছু গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। আবার দুর্ভাগাদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। তাতে তাদের ও দুর্ভাগ্যের কিছু আলামতও উল্লেখ করা হয়েছে। এসবের উদ্দেশ্য হলো– এসব নেক আমল ও সৎগুণ এবং বদ আমল ও বদ অভ্যাসের বিধান বর্ণনা করা, এ দ্বারা কোন ব্যক্তি বিশেষকে তিরস্কার করা উদ্দেশ্য হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا.

"আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদাচার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অনেক কষ্ট করে তাকে গর্ভেধারণ করেছে এবং ভীষণ কষ্ট করে প্রসব করেছে।" (সূরা আহযাব-১৫)

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্যবানদের এবং দুর্ভাগ্যদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, এটা চলেছে পরের আঠার আয়াত পর্যন্ত।

তেমনি আরো কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো :

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ : مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ـ

"যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের প্রতিপালক কী নাযিল করেছেন? তখন তারা বলে– উত্তরসূরিদের উপকথা!" (সূরা নাহল-২৪)

২. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

www.pathagar.com

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا خَيْرًا ـ

"আর মুত্তাকীদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো– তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছেন? তাঁরা বলল– কল্যাণকর বিষয়।" (নাহ্‌ল-৩০)

৩. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ـ

"আল্লাহ এক জনপদের উদাহরণ দিয়েছেন, যা ছিল– নিরাপদ ও শান্ত। যেখানে সবদিক থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের নাশুক্‌রী করল। তাদের এ অপকর্মের জন্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা আর ভয়ের পোশাক পরিয়ে এর স্বাদ চাকালেন।" (নাহ্‌ল-১১২)

৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ـ فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَا اٰتٰهُمَا فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ

"তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, আর তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল– তখন সে গর্ভবতী হলো। অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে লাগল। তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়ই আল্লাহকে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা যে, তুমি যদি আমাদেরকে সুস্থ ও ভাল দান কর তবে আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করব। অতঃপর যখন তাদেরকে সুস্থ ও ভাল দান করা হলো। তখন দানকৃত বিষয়ে অংশীদার তৈরী করতে লাগল। আসলে আল্লাহ তাদের শরীক সাব্যস্ত করা থেকে অনেক উর্ধ্বে।" (সূরা আ'রাফ-১৮৯-১৯০)

www.pathagar.com

৫. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত নয়, যারা যাকাত দান করে থাকে এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে এবং যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে। তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা শীতল ছায়াময় উদ্যান জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। আর তারা তাতে চিরকাল থাকবে।" (মুমিনুন-১-১১)

৬. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ـ

"যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যে পেছনে নিন্দা করে, একের কথা অন্যের কাছে গেয়ে ফিরে, যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমালঙ্ঘন করে, সে পাপিষ্ঠ, কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত। এ কারণে যে, সে ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে : সেকালের উপকথা! আমি তার নাক দাগিয়ে দেব।" (সূরা ক্বলম-১০-১৬)

www.pathagar.com

এসব আয়াতে যেসব দোষ-গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা কোন ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার প্রয়োজন নেই। যেমন– আল্লাহ তা'আলার একটি উদাহরণ :

كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاَةُ حَبَّةٍ ـ

"যেমন একটি শস্যবীজ যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করল, প্রত্যেক শীষে একশো শস্যদানা।" (বাকারা-২৬১)

এ উদাহরণ নাযিল হওয়ার কারণে যেমন এমন শস্যবীজ বাস্তবে বর্তমান থাকা জরুরি নয় এবং খুঁজে বের করারও প্রয়োজন নেই, কেননা এখানে শুধু সওয়াবকে বর্ধিত করার কথা বুঝানোই এ আয়াতের উদ্দেশ্য।

সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যের দোষ-গুণ বর্ণনা করার এলাহী উদ্দেশ্য হলো যারা সৌভাগ্যবান হতে চায় তারা যেন সৌভাগ্যের গুণাবলী নিজের মধ্যে তৈরী করে। আর দুর্ভাগ্যের দোষগুলো বর্জন করে। এমন দোষ-গুণসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বিশেষকে কটাক্ষ করা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়।

যদি আয়াতে উল্লিখিত অধিকাংশ বা সব বৈশিষ্ট্যাবলী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে তা হবে লক্ষ্যহীন। এর জন্য অন্য সব ক্ষেত্রে বাস্তবতার তালাশে নিয়োজিত হওয়াকে অত্যাবশ্যকীয় করবে না।

আয়াতের ব্যাখ্যাকে প্রশ্নোত্তরের রূপদান

কখনো কুরআনে কারীমে আগের আয়াতে উদ্ভূত কোন সন্দেহ খণ্ডন করে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয় বা সহজবোধ্য উহ্য কোন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয় যাতে পূর্বের কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখানে বাস্তবিক কোন প্রশ্নকারী নেই। তারপরও সাহাবায়ে কিরাম এ ধরনের আয়াতগুলোকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজেরাই প্রশ্ন তৈরী করতেন এবং জবাব দিতেন অর্থাৎ আয়াতটিকে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু আমরা যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখি তাহলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি আয়াত সুবিন্যস্ত। এক অংশ অপর অংশের পরে নাযিল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। একেকটি আয়াত সুবিন্যস্ত। কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই তাতে আলোচিত কথাগুলোকে আলাদা করা যায় না।

আয়াতের মান বিবেচনায় আগ-পিছ করা

কখনো সাহাবায়ে কিরাম উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আয়াতগুলোর মধ্যে আগ-পিছ করতেন। এ আগ-পিছ করে তারা এটা বুঝাতেন না যে, আগের আয়াত আগে অবতীর্ণ হয়েছে এবং পরের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে বরং এখানে আয়াতে

www.pathagar.com

উল্লিখিত বক্তব্যের মান বুঝানো উদ্দেশ্য হতো। যেমন– হযরত ইবনে ওমর (রা.) নিম্নের আয়াতটিতে যে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তা যাকাতের হুকুম নাযিল হওয়ার আগে ছিল বলে বর্ণনা করতেন। আয়াতটি হলো–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ـ

"আর যারা সোনা-রূপা পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ দাও, যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠে দাগ দেয়া হবে। সেদিন বলা হবে, এটিই তো তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করেছিলে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জিভূত করতে তা আস্বাদন কর।" (তওবা-৩৪-৩৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে, উল্লিখিত আয়াতটি আগে নাযিল হয়েছে এবং যাকাতের বিধান সম্বলিত আয়াত পরে নাযিল হয়েছে। কেননা এ আয়াতটি সূরা তওবার আয়াত। আর সূরা তওবা সবার শেষে নাযিল হয়েছে। তাছাড়া নবীজির জীবনের শেষ দিকে যেসব ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে এ আয়াত সেসব ঘটনার একটি। আর যাকাতের বিধান তো এর কয়েক বছর আগেই নাযিল হয়েছিল। সুতরাং এ আয়াত যাকাতের বিধানের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে ওমর (রা.) উল্লিখিত আয়াতটি সংক্ষিপ্ত হিসেবে যাকাতের বিস্তারিত আয়াতের আগে বর্ণনা করেছেন মানের দিকে লক্ষ্য রেখে, কারণ মানের দিক থেকে সংক্ষিপ্তটি আগে আসে আর বিস্তারিতটি পরে আসে।

মুফাস্‌সির আলিমের দু'টো শর্ত

মুফাস্‌সির আলিমদের জন্য দু'টো জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। যা মুফাস্‌সির এর জন্য পূর্বশর্ত।

এক. যেসব আয়াতে যুদ্ধ ও ঘটনাবলীর বর্ণনা রয়েছে এবং সেসবের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা জানতে হবে। কেননা এসব জানা ছাড়া সংশ্লিষ্ট আয়াতের মূলতত্ত্ব অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।

দুই. যেসব আয়াতে বিভিন্ন ধরনের শর্ত-শরায়েত বর্ণনা করা হয়েছে। তার কারণ ও উপকারিতার জ্ঞান লাভ করতে হবে।

www.pathagar.com

কুরআনের কোথাও কোথাও কঠোর বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সেসবের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। এসব না জানলে শানে নুযূল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে না।

আয়াতে উদ্ভূত সন্দেহ দূরীকরণের বিদ্যা

এখানে বিভিন্ন আয়াতে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

تَوْجِيْه-এর অর্থ :

তাওজীহ অর্থ হলো– বক্তব্যের কারণ বর্ণনা করা। মোটকথা, কোন আয়াতে দৃশ্যত বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ উত্থাপিত হয় বা দু'টো আয়াত দৃশ্যত পরস্পর বিরোধী মনে হয় বা আয়াতের মূল লক্ষ্য বুঝতে নবীনরা বেগ পায় বা আয়াতের শর্তসমূহের উপকারিতা বোধগম্য হয় না। যখন মুফাস্‌সির এসব সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে বের করে সহজবোধ্য করে তোলে একেই توجيه বলে।

توجيه-এর কয়েকটি উদাহরণ

এক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا.

"হে হারুনের ভগ্নি! তোমার পিতা পাপী ছিল না আর তোমার মাতাও আল্লাহদ্রোহী না।' (মারইয়াম-২৮)

এখানে একটি জটিলতা দেখা দিয়েছে; সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন– হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই ছিলেন হারুন, আর মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর মধ্যবর্তী সময়টা অনেক দীর্ঘ, তাহলে হারুন কিভাবে মারইয়ামের ভাই হলেন, প্রশ্নকারী মনে করেছিল এখানে হারুন বলে হযরত মূসা (আ.)-এর ভাইকেই বুঝানো হয়েছে। তাই তাঁর সামনে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবাবে বলেন– বনী ইসরাঈলের একটা ভাল অভ্যাস ছিল। তারা নেক লোকদের নামে নিজেদের নামকরণ করত। এখানে হারুন বলতে মূসা (আ.)-এর ভাই হারুনকে বুঝানো হয়নি বরং মারইয়াম এর এক ভাই ছিল হারুন তাকে বুঝানো হয়েছে।

দুই. মহানআল্লাহ বলেন :

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا، وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا.

www.pathagar.com

"আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে এমন অবস্থায় একত্রিত করব যে, তারা মুখে ভর দিয়ে চলবে, অন্ধ, বধির ও মূক হবে। তারা জাহান্নামে অবস্থান করবে। যখনই তা একটু স্তিমিত হবে, তখনই আমি আগুনের শিখাকে উন্নীত করে দেব।' (বনী ইসরাঈল-৯৭)

দুনিয়াতে কোন মানুষকে তো মুখের উপর ভর দিয়ে চলতে দেখা যায় না। এ জন্য এটা অসামঞ্জস্যশীল মনে হয়েছে, ফলে সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করেন : হাশরের দিন মানুষ কিভাবে মুখে ভর দিয়ে চলবে?

প্রিয়নবী জবাবে বলেন :

اِنَّ الَّذِىْ اَمْشَاهُ فِى الدُّنْيَا عَلٰى رِجْلَيْهِ لَقَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّمْشِيَهُ عَلٰى وَجْهِهٖ ـ

"যে মহান সত্তা মানুষকে দুনিয়াতে পায়ের উপর ভর দিয়ে চলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি নিঃসন্দেহে মুখের উপর ভর দিয়ে চলার শক্তিও দিতে সক্ষম।" (মিশকাত-৪৮৩)

তিন. দু'টি আয়াতের বক্তব্য দৃশ্যত পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক। যেমন দু'টো আয়াত :

١. فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَآءَلُوْنَ.

"এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আত্মীয়-আত্মীয়তে আর সম্পর্ক থাকবে না আর একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না।" (সূরা মুমিনুন-১০১)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ـ

"আর তারা একে অন্যের সামনা-সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।" (সফ্ফাত-২৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, দু'টো আয়াতে দৃশ্যত দুই রকম বক্তব্য বুঝা যাচ্ছে। এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা কিভাবে হবে?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে কথাবার্তা হবে না, এটা হবে হাশরের ময়দানে। আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, এটা হবে জান্নাতে প্রবেশের পর।

চার. হযরত আয়িশা (রা.) কে প্রশ্ন করা হলো– সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করা যদি ওয়াজিব হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা কেন বললেন :

www.pathagar.com

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا.

"(কেউ যদি হজ্জ ও ওমরা সম্পন্ন করে) এ দু'য়ের মাঝে সাঈ করে (দৌড়ায়) তাতে তার কোন অসুবিধা নেই।" (বাকারা-১৫৮)

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন– মুশরিকরা হজ্জ ও ওমরার আমলগুলোর মধ্যে অনেক শিরক ও বিদআত কাজ আবিষ্কার করেছিল। পাহাড় দু'টোতে তারা মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা যখন সাঈ করত তখন সেগুলোর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করত। এ জন্য অনেক সাহাবায়ে কিরাম সাঈ থেকে বিরত থাকতে থাকেন। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা 'কোন অসুবিধা নেই' (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ) ইরশাদ করেছেন। আসলে তো সাঈ করা ওয়াজিব।

পাঁচ. আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، اِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا.

"যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেবে, তাহলে নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন অসুবিধা নেই, কাফিররা নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (নিসা-১০১)

হযরত ওমর (রা.) আয়াতে উল্লিখিত 'তোমরা যদি আশংকা কর' শর্তটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– এটা আল্লাহ তা'আলার একটি দান, তোমরা আল্লাহ তা'আলার দান গ্রহণ কর। মহানুভব যারা তারা দানের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা করেন না। সুতরাং আয়াতে সে শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'কাফিরদের পক্ষ থেকে বিপদের আশংকা থাকলে তোমরা নামায কসর করবে' এ শর্তটি শুধু নাযিল হওয়ার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। এটা বলে আল্লাহ তা'আলা ঐ সময়ের একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু বিধানটি সম্পূর্ণ শর্তমুক্ত। অর্থাৎ সফরে বের হলেই শত্রুর ভয় থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায়ই নামায কসর পড়বে।

تَوْجِيْه-এর আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। এখানে শুধু তাওজীহ কাকে বলে তা-ই শুধু বুঝানো উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

শানে নুযূল ও সংশয় নিরসন সম্পর্কিত উপসংহার

ইমাম বুখারী (র.) (১৯৪-২৫৬ হি.) ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি.) ইমাম হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (৩২১-৪০৫ হি.) তাদের হাদীস গ্রন্থের তাফসীর অধ্যায়ে সাহাবায়ে কিরাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদে এ বিষয়ে যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন তা আমি আমার এ পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে সংক্ষেপে ও পরিমার্জিত আকারে সন্নিবেশন করা উপযুক্ত মনে করছি। আর এর লক্ষ্য দু'টো :

১. এ অধ্যায়ে যে পরিমাণ হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে, সে পরিমাণ হাদীস ও সাহাবাদের বাণী স্মরণ রাখা মুফাস্‌সিরগণের জন্য জরুরি। এসব হাদীসে কুরআন মাজীদের দুর্বোধ্য শব্দাবলীর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

২. শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাস্‌সির আলিমগণ যেসব রেওয়ায়াত করেন তার অধিকাংশই কিন্তু আয়াতের অর্থ ও লক্ষ্য বুঝার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু উপরে উল্লিখিত তিনটি হাদীস গ্রন্থে সে গুটিকয়েক ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে তা অবশ্য নির্ভরযোগ্য। হাদীস বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের কাছে এ তিনটি গ্রন্থ খুবই গ্রহণযোগ্য।

ইবনে ইসহাক, ওয়াকিদী ও কালবী (র.)-এর অতিরঞ্জন

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (মৃ-১৫১ হি.), মুহাম্মদ ইবনে উমর আল ওয়াকিদী (মৃ-২০৭ হি.) ও মুহাম্মদ ইবনে সায়েব কালবী (মৃ-১৪৬ হি.) কুরআন মাজীদের প্রত্যেকটি আয়াতের সাথে যেভাবে একেকটি ঘটনা জুড়ে দিয়েছেন তা অতিরঞ্জন ছাড়া আর কিছু নয়। মুহাদ্দিস ওলামায়ে কিরামের কাছে এসবের অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। সনদগুলো দুর্বল। সে ক্ষেত্রে তাফসীরের জন্য এগুলোকে শর্ত ঘোষণা দেয়া স্পষ্ট ভুল, যে মনে করে যে, এসব না জানলে কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝা যাবে না তারা আসলে কুরআনের মর্মার্থ বুঝার তাওফীক লাভ করা থেকে বঞ্চিত হবে।

আল্লাহ তা'আলার কাছেই তাওফীক কামনা করি। তাঁর প্রতিই ভরসা করছি। তিনি তো মহান আরশের অধিপতি।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুর্বোধ্যতার আরো কিছু কারণ ঃ এর আগের তিনটি পরিচ্ছেদব্যাপি কুরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতার যেসব কারণ বর্ণনা করা হয়েছে সেসব ছাড়াও আরো কিছু কারণ রয়েছে, যা এখানে উপস্থাপন করা হলো–

১. আয়াতের অংশ বিশেষ উহ্য রাখা,

২. একটির জায়গায় অন্যটি উল্লেখ করা,

৩. যে শব্দটি আগে উল্লেখ থাকার কথা তাকে পরে উল্লেখ করা আর যা পরে উল্লেখ থাকার দাবি রাখে তাকে আগে উল্লেখ করে দেয়া।

৪. এমন শব্দ ব্যবহার করা যা দ্বারা কয়েকটি অর্থ প্রকাশ করতে পারে (مُتَشَابِهَات)

৫. ইশারা করে কথা উল্লেখ করা।

৬. পরোক্ষ ইঙ্গিত ব্যবহার করা।

৭. রূপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা। যেমন- مَجَازِ عَقْلِىْ ও اِسْتِعَارَة ব্যবহার করা।

৮. উদ্দিষ্ট ভাবকে ঐ ভাব প্রকাশক উদাহরণের মাধ্যমে চিত্রিত করা। নিম্নে এসবের উদাহরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করছি, যেন স্পষ্ট একটি ধারণা লাভ করা যায়।

উহ্য রাখা

বাক্যে যেসব শব্দ উহ্য রাখা হয় তা বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন– বাক্যে সম্বন্ধসূচক শব্দ (مضاف), গুণ প্রকাশক শব্দ (موصوف), একটি শব্দ অন্য একটি শব্দের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যে শব্দের সাথে সম্পৃক্ত তা কখনো উহ্য রাখা হয় ইত্যাদি আরো অনেকভাবে বাক্যাংশ উহ্য রাখা হয়। যেমন :

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ.

আসলে বাক্যটি এমন ছিল : وَلٰكِنَّ الْبِرَّ بِرَّ مَنْ اٰمَنَ.

"কিন্তু পুণ্য তো হলো ঐ ব্যক্তির পুণ্য যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে।" (বাকারা-১৭৭)

এখানে بِرَّ مَنْ অর্থাৎ (مضاف) 'ঐ ব্যক্তির পুণ্য' বাক্যাংশটি উহ্য রয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً.

আসলে বাক্যটি এমন ছিল : وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ اٰيَةً مُبْصِرَةً.

www.pathagar.com

"আমি সামুদ জাতিকে দৃষ্টি আকর্ষণকারী নিদর্শনস্বরূপ উষ্ট্রীটি দিয়েছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

এখানে اٰيَةً অর্থাৎ 'নিদর্শন' (موصوف) শব্দটি উহ্য রয়েছে।

৩. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ.

আসলে বাক্যটি এমন ছিল : وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمْ حُبَّ الْعِجْلِ.

তাদের অন্তরে বাছুর প্রীতি তৈরী করা হলো।

এখানে حُبَّ অর্থাৎ 'প্রীতি' (مضاف) শব্দটি উহ্য রয়েছে।

৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ.

মূলত বাক্যটি এমন ছিল : اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ قَتْلِ نَفْسٍ.

"আপনি কি একটি পবিত্র জীবন হত্যা করলেন কাউকে হত্যা করা ছাড়াই।" (সূরা কাহাফ-৭৪)

এখানে بِغَيْرِ শব্দটির পর قَتْلِ অর্থাৎ 'হত্যা' (مضاف) শব্দটি উহ্য রয়েছে।

৫. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ.

আসলে বাক্যটি এমন ছিল : اَوْ بِغَيْرِ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ.

"বা পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ করার কারণ ছাড়া।" (মায়িদা-৩২)

এখানে بِغَيْرِ অর্থাৎ ছাড়া/ব্যতীত (مضاف) শব্দটি উহ্য রয়েছে।

৬. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

মূলত বাক্যটি আসলে এমন ছিল : مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ.

"যারা আকাশে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে।" (সূরা আর রহমান-২৯)

এখানে এমন অর্থ হবে না যে, যারা আসমান ও পৃথিবী উভয় জায়গায় আছে।

আয়াতটিতে فِى الْاَرْضِ-এর পূর্বে আরেকটি مَنْ অর্থাৎ 'যারা' (موصوف) শব্দটি উহ্য রয়েছে।

www.pathagar.com

৭. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ـ

আসলে আয়াতটি এমন ছিল :

ضِعْفَ عَذَابِ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ عَذَابِ الْمَمَاتِ ـ

"ইহজীবনে দ্বিগুন শাস্তি ও পরজীবনে দ্বিগুন শাস্তি।" (বনী ইসরাঈল-৭৫)

এখানে مَمَاتْ ও حَيَاةْ এর আগে عَذَابٌ বা 'শাস্তি' (مضاف) শব্দটি উহ্য রয়েছে।

৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ـ

মূলত আয়াতটি এমন ছিল : وَسْئَلْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ ـ

"এলাকাবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।"

এখানে اَهْلٌ বা 'অধিবাসী' (مضاف) শব্দটি উহ্য রয়েছে।

৯. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا ـ

আসলে আয়াতটি এমন ছিল : فَعَلُوْا مَكَانَ شُكْرِ نِعْمَةِ اللّٰهِ كُفْرًا ـ

আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। (ইব্রাহীম-২৮)

এখানে بَدَّلُوْا অর্থ فَعَلُوْا অর্থাৎ করেছে। আর شُكْرِ 'কৃতজ্ঞতার জায়গায়' (مضاف ও مضاف اليه) বাক্যাংশ উহ্য রয়েছে।

১০. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ ـ

আয়াতটি মূলত এমন ছিল : يَهْدِىْ لِلْخَصْلَةِ الَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ ـ

"সেই গুণাবলীর প্রতি পথ প্রদর্শন করে যা বেশি উপযোগী এবং উত্তম।" (বনী ইসরাঈল-৯)

এখানে لِلْخَصْلَةِ অর্থাৎ গুণাবলীর প্রতি (موصوف) শব্দটি উহ্য রয়েছে।

১১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

www.pathagar.com

বাক্যটি মূলত ছিল : بِالْخَصْلَةِ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

"ঐ স্বভাবের মাধ্যমে যা খুব ভাল।" (ফুস্‌সিলাত-৩৪)

এখানে بِالْخَصْلَةِ অর্থাৎ 'স্বভাবের মাধ্যমে' (موصوف) শব্দটি উহ্য রয়েছে।

১২. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اَلَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى ـ

আসলে মূল বাক্যটি এমন ছিল :

اَلَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْكَلِمَةُ الْحُسْنٰى وَالْعِدَةُ الْحُسْنٰى ـ

"যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে আগে থেকে কল্যাণকর বাণী এবং কল্যাণকর ওয়াদা সুনির্ধারিত আছে।" (আম্বিয়া-১০১)

এখানে اَلْكَلِمَةُ الْحُسْنٰى وَالْعِدَةُ অর্থাৎ 'কল্যাণকর বাণী এবং ওয়াদা' (প্রথম موصوف/صفت ও দ্বিতীয় موصوف) বাক্যাংশ উহ্য রয়েছে।

১৩. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ـ

মূলত বাক্যটি এমন ছিল : عَلٰى عَهْدِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ـ

"সুলাইমানের রাজত্বকালে।" (বাকারা-১০২)

এখানে عَهْدٌ অর্থাৎ 'আমল বা কাল' (مضاف) শব্দটি উহ্য রয়েছে।

১৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ ـ

মূলত বাক্যটি এমন ছিল : مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى اَلْسِنَةِ رُسُلِكَ ـ

"তোমার রাসূলগণের মুখে আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছ।" (আলে-ইমরান-১৯৪)

এখানে اَلْسِنَةِ অর্থাৎ 'মুখে' (প্রথম مضاف) শব্দটি উহ্য রয়েছে।

১৫. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ

আয়াতটি মূলতঃ ছিল : اِنَّا اَنْزَلْنَا الْقُرْاٰنَ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ

www.pathagar.com

"নিশ্চয় আমি কদর রাতে কুরআন নাযিল করেছি।" (সূরা কদর-১)

এখানে أَنْزَلْنَاهُ-এর মধ্যে هُ হলো সর্বনাম, (ضمير)। এর অর্থ হলো– 'তা'। এর আগে قرأن (বিশেষ্য) শব্দটি উল্লেখ না করেই هُ-এর সাথে قرأن কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে هُ এর লক্ষ্য (مرجع) উহ্য রাখা হয়েছে।

১৬. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ـ

মূলত বাক্যটি এমন ছিল : حَتّٰى تَوَارَتِ الشَّمْسِ بِالْحِجَابِ ـ

"এমনকি সূর্য লুকিয়ে গেছে (অর্থাৎ অস্ত গেছে)।" (সোয়াদ-৩২)

এখানেও تَوَارَتْ অর্থাৎ 'লুকিয়ে গেছে'-এর লক্ষ্য (مرجع এর ضمير) উহ্য রয়েছে।

১৭. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَمَا يُلَقّٰهَا ـ

মূলত ছিল : وَمَا يُلَقّٰى خَصْلَةَ الصَّبْرِ ـ

"এবং ধৈর্যের গুণ দান করা হবে না।" (হা-মীম সাজদা-৩৫)

এখানেও هَا সর্বনামের (ضمير) লক্ষ্য (مرجع) অর্থাৎ 'সবরের গুণ' শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে।

১৮. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ـ

বাক্যের طَاغُوْتَ শব্দে যাঁরা যবর (نصب) দিয়ে পড়েন তাঁদের মতে বাক্যাংশের মূল রূপ হলো– وَمَنْ عَبَدَ الطَّاغُوْتَ ـ

"এবং যারা তাগুতকে ইবাদত করে।"

এখানে مَنْ অর্থাৎ যারা (اسم موصول) উহ্য রাখা হয়েছে।

১৯. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَصِهْرًا ـ

বাক্যটি মূলত এমন ছিল : فَجَعَلَ لَهٗ نَسَبًا وَصِهْرًا ـ

"তারপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।" (ফুরকান-৫৪)

এখানে لَهٗ-এর লাম (حرف جر) কে উহ্য রেখে هُ -কে (مجرور) جَعَلَ (ক্রিয়া)-এর সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

২০. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ ـ

বাক্যটি মূলত এমন ছিল : وَاخْتَارَ مُوْسٰى مِنْ قَوْمِهٖ ـ

"মূসা তার জাতি থেকে মনোনীত করল।" (আ'রাফ-১৫৫)

এখানেও من অর্থাৎ 'থেকে' (حرف جر) শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে।

২১. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ـ

মূল বাক্যটি এমন ছিল : اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا نِعْمَةَ رَبِّهِمْ ـ

"শোন! আদ জাতি তো তাদের রবের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।" (সূরা হূদ-৬০)

অথবা মূল বাক্য এমনও হতে পারে : كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ـ

"শোন! আদ জাতি তো তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে।"

২২. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ ـ

আয়াতটি আসলে এমন হবে : قَالُوْا تَاللّٰهِ لَا تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ ـ

"তারা বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত হবেন না।" (সূরা ইউসুফ)

এখানে تَفْتَؤُا শব্দের পূর্বে لَا উহ্য রাখা হয়েছে।

২৩. মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

মূলত আয়াতাংশটি এমন ছিল :

يَقُوْلُوْنَ : مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ـ

"তারা বলত, আমরা মূর্তিপূজা তো আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য করি।" (যুমার-৩)

এখানে শুরুতেই يَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ – 'তারা বলত' শব্দটি উহ্য রয়েছে।

২৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ـ

www.pathagar.com

মূলত আয়াতটি এমন ছিল : اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ اِلٰهًا ـ

যারা বাছুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এখানে শেষে اِلٰهًا (দ্বিতীয় مفعول) 'উপাস্য হিসেবে' শব্দটি উহ্য আছে,

২৫. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ـ

মূলত আয়াতটি এমন ছিল : تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ ـ

"তোমরা আমাদের কাছে ডান-বাম (সব) দিক থেকে আসতে।" (সফ্ফাত-৩৮)

এখানে وَعَنِ الشِّمَالِ অংশটুকু উহ্য রয়েছে।

২৭. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰئِكَةً ـ

আয়াতাংশটি মূল এমন ছিল : لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا بَدَلاً مِّنْكُمْ ـ

"আমি চাইলে তোমাদের বদলে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম।" (যুখরুফ-৬০)

এখানে بَدَلاً অর্থাৎ 'বদলে' (مفعول) শব্দটি উহ্য রয়েছে।

২৮. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ ـ

বাক্যটি আসলে এমন ছিল : اِمْضِ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ ـ

"চল, যেভাবে তোমার রব তোমাকে বের করেছেন।" (আনফাল-৫)

আরো কিছু উহ্য থাকার ধরন

"اِنَّ" শব্দটির পর যে বাক্যাংশ উল্লিখিত হয় তা দুই ভাগে বিভক্ত। এক. কারো সম্পর্কে বলা হবে (اسم)। দুই. যা বলা হবে (خبر)। কখনো এই "اِنَّ" শব্দের পর তার দ্বিতীয় অংশ (خبر) উহ্য রাখা হয়। কখনো শর্তযুক্ত বাক্যে (جمله شرطيه) মূল শর্তটি উহ্য রাখা হয়, কখনো ক্রিয়ার কর্মকে উহ্য রাখা হয়। কখনো 'যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়' (مبتدا) তাকেও উহ্য রাখা হয়। এমন আরো অনেক কিছু উহ্য থাকার ব্যাপার কুরআনে কারীমে দেখতে পাওয়া যায় যখন পরের বাক্যে উহ্য থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

যেমন :

এক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِيْنَ.

আসলে আয়াতটি এমন ছিল : فَلَوْ شَاءَ هِدَايَتَكُمْ لِهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ .

"তিনি যদি তোমাদের হিদায়াতের ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে অবশ্যই হিদায়াত করতেন।" (আন'আম-১৪৯)

এখানে (فَلَوْ شَاءَ) 'যদি চাইতেন' এর পর মূল শর্ত (هِدَايَتَكُمْ) 'তোমাদেরকে হিদায়াত করতে' বাক্যাংশটি উহ্য রয়েছে।

দুই. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ .

মূলতঃ এমন ছিল- هٰذَا الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ .

"এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত) সত্য।" (বাকারা-১৪৭)

এখানে ইশারাসূচক শব্দ هذا উহ্য রাখা হয়েছে।

তিন. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لاَ يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا .

আয়াতে مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ -এর পরে-

"وَمَنْ اَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ" অংশটুকু উহ্য আছে।

পরবর্তী অংশ ... اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً পূর্বোক্ত বাক্যাংশ উহ্য থাকার প্রমাণ বহন করে।

চার. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ . وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ اِلاَّ كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ .

www.pathagar.com

এখানে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -এর পরে "اَعْرَضُوْا" (جزاء شرط) শব্দটি উহ্য আছে। যা পরবর্তী অংশ প্রমাণ করে।

আয়াতের অর্থ : "তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমাদের সামনে-পেছনে যা আছে সে ব্যাপারে সাবধান হও। যাতে তোমরা দয়া পেতে পার। তখন তারা বিমুখ হয়ে যায়। আসলে তাদের রবের কোন নিদর্শন তাদের কাছে আসে তখনই তারা তা থেকে বিমুখ হয়।" (সূরা ইয়াসীন-৪৫-৪৬)

اِذْ শব্দের ব্যবহার

কুরআনে মাজীদে কিছু আয়াত আছে, যেগুলো اِذْ অব্যয় দিয়ে শুরু হয়েছে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ ـ

"যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন...।" (বাকারা-৩০)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اِذْ قَالَ مُوْسٰى ـ

"যখন মূসা বলল...।" (বাকারা-৫৪)

"اِذْ" "শব্দটি কখনো কোন কাজের সময় বা স্থান নির্দেশ করে, তখন সংশ্লিষ্ট আয়াতে اِذْ শব্দটিকে ভয় দেখানোর অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন লোকেরা ভয়ানক জায়গাগুলোকে এবং বড় বড় ঘটনাকে শুনে শুনে উল্লেখ করে থাকে। আর তখন বাক্যের বিন্যাস (تركيب)ও কোথায় যের-যবর হবে (محل اعراب) তার লক্ষ্য রাখে না। মূল কথাটা উপস্থাপন করাটাই উদ্দেশ্য থাকে। যেন শ্রোতার মনে কথাটা অংকিত হয়ে যায়।

সুতরাং অভিজ্ঞতা হলো, এসব ক্ষেত্রে কোনটার কারণে যবর হবে, কোনটার কারণের যের বা পেশ হবে (عامل) তা খোঁজার প্রয়োজন নেই।

اَنْ-এর শুরুতে যের দানকারী অব্যয় উহ্য থাকা

'করা' বা 'হওয়া'-এর অর্থ বুঝায় (مصدرية) এমন اَنْ-এর শুরুতে যের প্রদানকারী অব্যয় (حرف جر) উহ্য থাকাও আরবী ভাষায় প্রসিদ্ধ একটি রীতি, যেমন اَنْ-এর জায়গায়- بِاَنْ বা لِاَنْ

উদাহরণতঃ

١. قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ...

এখানে اَنْ-এর আগে "ب" উহ্য রয়েছে অর্থাৎ بِاَنْ।

www.pathagar.com

২. ... ذَالِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى

এখানে اَنْ -এর আগে ل উহ্য রয়েছে অর্থাৎ لِاَنْ।

لَوْ দ্বারা শর্তযুক্ত বাক্যে শর্তোত্তর অংশ উহ্য রাখা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ـ

"আর তুমি যদি দেখতে! যখন যালিমরা মরণকোলে ঢলে পড়বে।"

আরো ইরশাদ করেন : وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ـ

"যদি যালিমরা যুলুমের শাস্তি দেখতে পেত!"

এমন আয়াতে শর্তোত্তর অংশ (جواب شرط) উহ্য থাকে। কেননা এ শর্ত দ্বারা আসলে আশ্চর্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং এখানেও উহ্য অংশ খোঁজ করার প্রয়োজন নেই।

'ইবদাল' বা এক শব্দের স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার

এক শব্দের স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহারের অনেকগুলো শৈল্পিক ধরন রয়েছে।

একটি (فعل) কাজ বুঝে তাতে অন্য কাজের (فعل) শব্দ ব্যবহার

মহান আল্লাহ একটি فعل বা কাজের কথা বুঝাতে অন্য কোন فعل বা কাজের শব্দ বিভিন্ন লক্ষে ব্যবহার করেছেন। যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া এ পুস্তকের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। সংক্ষেপে শুধু উদাহরণমূলক আলোচনা করা হলো।

এক. মক্কার মুশরিকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কটাক্ষ করে নিজেরা পরস্পর বলত : أَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ـ

এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মূর্তিদের আলোচনা করে?

এখানে يَسُبُّ অর্থাৎ 'গালি দেয়া' কাজের (فعل) জায়গায় يَذْكُرُ অর্থাৎ 'আলোচনা করা' (فعل) কাজের উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে বাক্যটি এমন হতো : أَهٰذَا الَّذِىْ يَسُبُّ اٰلِهَتَكُمْ ـ

www.pathagar.com

"এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মূর্তিদেরকে গালি-গালাজ করে?"

মুশরিকরা নিজেদের মূর্তিদের ক্ষেত্রে গালি দেয়া শব্দটি ব্যবহার করতে বেয়াদবী ভেবে অপছন্দ করেছে তাই يَسُبُّ-এর বদলে يَذْكُرُ শব্দ ব্যবহার করেছে।

ফার্সি ভাষায়ও এমন ধরনের পরিভাষা প্রচলিত আছে। যেমন– 'অমুকের দুশমন অসুস্থ হয়েছে।' 'জনাবের দাস-দাসীদের আগমন করে আমাদেরকে ধন্য করেছেন।' 'জনাবের দাস-দাসীরা এ বিষয়ের ব্যাপারে অবগত।'

তারা প্রথম বাক্যটি 'অমুক অসুস্থ হয়েছেন' এ অর্থে ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় বাক্যটি 'অমুক সম্মানিত ব্যক্তি আগমন করেছেন' এবং তৃতীয় বাক্যটি অমুক মাননীয় ব্যক্তি বিষয়টি জানেন। তাদের এসব পরিভাষা আলোচ্য 'ইবদাল' (এক শব্দ ব্যবহার করে অন্য শব্দ বুঝানো)-এর অন্তর্ভুক্ত।

দুই. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :. وَلَاهُمْ مِنَّا يُصْحَبُوْنَ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে এটা ইরশাদ করেন। আসলে বাক্যটি এমন হবে– وَلَاهُمْ مِنَّا يُنْصَرُوْنَ .

"এবং তারা আমার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" (আম্বিয়া-৪৩

সাহায্য পেতে হলে যেহেতু সঙ্গ লাভ করা জরুরী তাই يُنْصَرُوْنَ -এর স্থলে يُصْحَبُوْنَ বা 'সঙ্গ লাভ করা শব্দ (فعل) ব্যবহার করা হয়েছে।

তিন. কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .

এখানে ثَقُلَتْ (ভারি) শব্দটি خَفِيَتْ (অজানা) শব্দের (فعل) বদলে ব্যবহৃত হয়েছে।

আয়াতের অর্থ হলো :

"আসমান ও যমীনে তা (কিয়ামত) অজানা।" (আ'রাফ-১৮৭)

কেননা কোন কিছু যখন অজ্ঞাত থাকে, তখন তা আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য ভারি হয়ে যায়।

www.pathagar.com

চার. মোহরের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ـ

এ আয়াতে طِبْنَ (খুশি হয়) শব্দটি عَفَوْنَ (ক্ষমা করে) শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহলে মূলত আয়াতটি এমন ছিল

فَإِنْ عَفَوْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ عَنْ طِيْبِهِ أَنْفُسِهِنَّ.

"তারা যদি খুশি হয়ে তোমাদের জন্য মোহরের কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়।" (নিসা-৪)

এক বিশেষ্যের পরিবর্তে অন্য বিশেষ্য[১]

এক. কখনো আল্লাহ তা'আলা একটি বিশেষ্যের জায়গায় অন্য আরেকটি বিশেষ্য উল্লেখ করেন, যেমন :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ.

"তাদের ঘাড় তার (নিদর্শনের) প্রতি অবনত হয়ে পড়ত।"

এখানে أَعْنَاقٌ শব্দটি (اِسْمٌ) বহুবচন এবং বুদ্ধিমত্তাহীন (جمع غير عاقل) তাই এর 'খবর' অর্থাৎ 'তার সম্পর্কে যা বলা হবে' তা একবচন স্ত্রী লিঙ্গ (واحد مؤنث) হওয়া আরবী ব্যাকরণের (نحو) দৃষ্টিতে যথাযুক্ত। অর্থাৎ خَاضِعِيْنَ না হয়ে خَاضِعَةً হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আয়াতে خَاضِعَةً -এর স্থলে خَاضِعِيْنَ ব্যবহার করা হয়েছে।

দুই. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ ـ

"আর সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।" (তাহরীম-১২)

টীকা-১. বিশেষ্য বা 'ইসম' হলো কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ইত্যাদির নাম, আর 'ফেয়েল' হলো ক্রিয়া বা কোন কাজ করা/হওয়া। 'হরফ' হলো 'অব্যয়' যেমন– সাথে, মধ্যে, থেকে, পর্যন্ত ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এখানে قَانِتِيْنَ শব্দটি (اسم) قَانِتَاتٍ-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

তিন. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ ـ

"এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (আলে-ইমরান-১২)

এখানে نَاصِرٌ (একবচন)-এর স্থলে نَاصِرِيْنَ (বহুবচন) ব্যবহৃত হয়েছে।

চার. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ـ

"তারপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে হিফাযত করতে পারে।" (হাক্কা-৪৭)

এখানে حَاجِزِيْنَ শব্দটি (বহুবচন) حَاجِزٌ (একবচন)-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

পাঁচ. মহান আল্লাহ বলেন : وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ـ

"কালের কসম! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।" (আসর : ১-২)

আয়াতে গোটা মানব জাতিকে একবচন শব্দ اِنْسَانٌ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এটা হয়েছে এজন্য যে, اِنْسَانٌ -একটি জাতির নাম। (اسم جنس)

ছয়. আল্লাহ তা'আলা বলেন : يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا .

"হে মানুষ! তুমি তোমার রবের কাছে পৌছা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করছ।" (ইন্‌শিকাক-৬)

আসলে বাক্যটির মর্মকথাটি এমন :

يَا بَنِيْ اٰدَمَ اِنَّكُمْ كَادِحُوْنَ اِلٰى رَبِّكُمْ كَدْحًا ـ

গোটা মানবমণ্ডলী বহুবচন হলেও একটি জাতি হিসেবে তা অন্যান্য অনেক জাতির তুলনায় একবচন। (اسم جنس) তাই اِنَّكَ كَادِحٌ একবচনই ব্যবহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

সাত. মহান আল্লাহ বলেন : وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ـ

"আর মানুষ তা (কুরআনের আমানত) বহন করল।" (আহযাব-৭৫)

এখানে اَفْرَادُ الْاِنْسَانِ (প্রত্যেকজন মানুষ) এর স্থানে শুধু اِنْسَانُ (মানুষ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আট. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

"নূহ জাতি রাসূলগণকে মিথ্যা বানিয়ে দিয়েছে।" (শু'আরা-১০৫)

এখানে اَلْمُرْسَلِيْنَ বলে শুধু নূহ (আ.) কে বুঝানো হয়েছে। সে হিসেবে একবচন শব্দ اَلْمُرْسَلْ (রাসূল) ব্যবহৃত হওয়ার কথা। কিন্তু اَلْمُرْسَلْ-এর স্থলে اَلْمُرْسَلِيْن (রাসূলগণ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

নয়. আল্লাহ বলেন : اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ـ

"নিশ্চয় আমি তোমাকে বিজয় দিয়েছি।" (ফাতাহ-১)

এখানে اِنَّا فَتَحْنَا বাক্যাংশটি اِنِّىْ فَتَحْتُ-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

দশ. আল্লাহ বলেন : اِنَّا لَقَادِرُوْنَ ـ

"অবশ্যই আমি ক্ষমতাবান।" (মা'আরিজ-৪০)

আসল বক্তব্য হলো– اِنِّىْ لَقَادِرٌ ـ

এগার. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ ـ

"কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন।" (হাশর-৬)

এখানে رُسُلَهٗ (বহুবচন) শব্দটি رَسُوْلَهٗ (একবচনের)-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'রাসূল' শব্দ দ্বারা এখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

বার. আল্লাহর বাণী : اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ـ -যাদেরকে লোকেরা বলেছে।

এখানে اَلنَّاسُ দ্বারা শুধু উরওয়া সাকাফী একাই উদ্দেশ্য।

তের. আল্লাহ বলেন : فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ ـ

"ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষুধার স্বাদ চাকালেন।" (নাহল-১১২)

এখানে طَعَمٌ (স্বাদ) এর পরিবর্তে لِبَاسٌ (পোশাক) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা পোশাক যেমন পুরো শরীরকে ঢেকে ফেলে তেমনি ক্ষুধার দুর্বলতাও পুরো শরীরকে প্রভাবিত করে।

চোদ্দ. আল্লাহ বলেন : صِبْغَةَ اللّٰهِ ـ – "আল্লাহর রং।" (বাকারা-১৩৮)

এখানে دِيْنٌ (ধর্ম) শব্দের স্থলে صِبْغَةٌ (রং) শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ 'ধর্ম' এবং 'রং'-এর মধ্যে সাদৃশ্যতা আছে, রং যেমন মনকে রঙিন করে তেমনি 'দ্বীন'ও মানুষের মনকে রাঙিয়ে তোলে অথবা খৃষ্টানদের রঙ দিয়ে গোসল করানোর অনুষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখানে 'রঙ' শব্দটি ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তাদের ঐ রঙের মধ্যে সফলতা নেই। আল্লাহর রঙ অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করার মধ্যেই সফলতা রয়েছে।

পনের. মহান আল্লাহ বলেন : وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ـ

"কসম, সিনাই পাহাড়ের।" (তীন-২)

এখানে سِيْنَاءٌ শব্দের পরিবর্তে سِيْنِيْنَ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ষোল. আল্লাহ তা'আলা বলেন : سَلَامٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ ـ

"ইলিয়াসের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।" (সফফাত-১৩০)

এখানে اِلْيَاسُ -এর স্থলে ال ياسين শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আগে-পরের আয়াতের শেষ শব্দে ছন্দ তৈরীর জন্য ال ياسين ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক তেমনি পূর্বের আয়াতের বর্ণিত (سنيين) ও একই উদ্দেশ্যে سيناء এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে।سنيين

www.pathagar.com

এক অব্যয়কে অন্য অব্যয়[১] দ্বারা পরিবর্তন করা

আল্লাহ তা'আলা কখনো একটি অব্যয় (حرف)-এর স্থলে অন্য অব্যয় (حرف) ব্যবহার করেন। যেমন–

এক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ.

"যখন তার রব পাহাড়ে তাঁর জ্যোতি প্রকাশ করলেন।" (আ'রাফ-১৪৩)

এখানে لِلْجَبَلِ-এর ل অব্যয়টি عَلٰى অব্যয়ের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করেন দ্বিতীয়বার আর প্রথমবার জ্যোতি প্রকাশ করেন গাছে।

দুই. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ .

"এবং তারা তার প্রতি অগ্রসর হয়।" (মুমিনুন-৬১)

তিন. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ

"নিশ্চয়ই আমি এমন যে, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায় না। কিন্তু যারা যুলুম করে।"

এখানে اِلَّا অব্যয়টি لٰكِنَّ (কিন্তু) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যটি আলাদা বাক্য (مستانفه)।

চার. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : لَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ .

"আমি তাদেরকে খর্জুর ডালে ডালে চড়াবই।" (তোয়াহা-৭১)

এখানে عَلٰى এর স্থলে فِىْ ব্যবহৃত হয়েছে।

পাঁচ. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ .

"নাকি তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে উঠে তারা শোনে?" (তূর-৩৮)

টীকা-১. 'হরফ' বা অব্যয় বলা হয়, আরবী ভাষার এমন শব্দ যা দ্বারা পরিপূর্ণ কোন অর্থ বুঝা যায় না। যখন তার সাথে অন্য কোন শব্দ যোগ করা হয় তখন অর্থ বুঝা যায়। যেমন– সাথে, থেকে, পর্যন্ত ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এখানে عَلٰى (উপরে) অব্যয়ের স্থলে فِىْ ব্যবহৃত হয়েছে।

ছয়. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اَلسَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ـ

"সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে।" (মুয্যাম্মিল-১৮)

এখানে بِهٖ-এর ب অব্যয়টি فِىْ-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাত. আল্লাহ তা'আলা বলেন : مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ ـ

"তা থেকে অহংকারী হয়ে।" (মুমিনুন-৬৭)

এখানেও بِهٖ-এর ب টি عَنْ-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

আট. আল্লাহ তা'আলা বলেন : اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ ـ

"অহংকার তাকে পাপকর্মে প্ররোচিত করেছে।" (বাকারা-২০৬)

এখানে اَخَذَتْهُ ক্রিয়াটি حَمَلَتْ ক্রিয়ার এবং بِالْاِثْمِ-এর "ب" টি عَلٰى -এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাক্যটি এমন ছিল : حَمَلَتْهُ الْعِزَّةُ عَلَى الْاِثْمِ ـ

নয়. আল্লাহ বলেন : فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ـ

"প্রজ্ঞাবান লোককে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে দেখ।" (ফুরকান-৫৯)

এখানে بِهٖ-এর "ب" অব্যয়টি عَنْ-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

দশ. আল্লাহ বলেন : وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ ـ

"তোমরা তোমাদের মালের সাথে তাদের মাল মিশ্রিত করে গ্রাস করো না।" (নিসা-২)

এখানে اِلٰى অব্যয়টি مَعَ-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

এগার. আল্লাহ বলেন : اِلَى الْمَرَافِقِ ـ – "কুনুইসহ।" -(মায়িদা-৬)

এ আয়াতাংশে مَعَ-এর বদলে اِلٰى ব্যবহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

বার. আল্লাহ বলেন : يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ ـ

"তা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে।" (দাহ্‌র-৬)

এখানে بِهَا-এর "ب" অব্যয়টি مِنْ অব্যয়ের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

তের. আল্লাহ বলেন :

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ.

"তারা আল্লাহর সঠিক মর্যাদা অনুভব করেনি, যখন তারা বলেছে, আল্লাহ কোন মানুষের কাছে কিছুই অবতীর্ণ করেননি।" (আনআম-৯১)

এ আয়াতে اِذْ অব্যয়টি اَنْ -এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। اِذْ قَالُوْا আসলে ছিল– اَنْ قَالُوْا।

এক বাক্যের বদলে অন্য বাক্য ব্যবহার করা

আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো এক বাক্যের জায়গায় অন্য বাক্য ব্যবহার করেন। যেমন– একটি বাক্য উহ্য কোন বাক্যে মর্মার্থ প্রকাশ করল এবং একটি বাক্য উহ্য আছে বলে প্রমাণ বহন করল। আর উহ্য বাক্যের বদলে উল্লিখিত বাক্য সন্নিবেশন করা হলো। যেমন–

এক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ـ

"তোমরা যদি তাদের সাথে মিলেমিশে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই।" (বাকারা-২২০)

আয়াতটি আসলে এমন ছিল :

وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَلَا بَأْسَ بِذَالِكَ فَاِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ ـ

"তোমরা যদি তাদের সাথে মিলেমিশে থাক তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ তারা তো তোমাদেরই ভাই।" ভাইয়ের অবস্থাই তো হলো যে, সে তার ভাইয়ের সাথে মিলেমিশে থাকবে।

দুই. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : لَمَثُوْبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ـ

www.pathagar.com

"(তারা যদি ঈমান আনত এবং মুত্তাকী হতো) তাহলে নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিদান সর্বোত্তম।" (বাকারা-১০৩)

আয়াতটি আসলে এমন ছিল : لَوَجَدُوْا ثَوَابًا وَّمَثُوْبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ـ

"..... তাহলে নিশ্চয় তারা প্রতিদান পেত। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিদান সর্বোত্তম।"

'لَوَجَدُوْا ثَوَابًا' "لَمَثُوْبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ." বাক্যাংশটিই প্রমাণ করে যে বাক্যাংশটি উহ্য রয়েছে।

তিন. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা বলেছিল : اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ـ

"সে যদি চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও পূর্বে চুরি করেছিল।" (ইউসুফ-৭৭)

আয়াতটি আসলে এমন ছিল :

اِنْ يَسْرِقْ فَلاَ عَجَبَ، فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ـ

"সে যদি চুরি করে তাহলে আশ্চর্যের কিছুই নেই, কারণ তার এক ভাইও আগে চুরি করেছিল।"

'فَقَدْ سَرَقَ' বাক্যাংশটিই প্রমাণ করে যে এখানে فَلاَ عَجَبَ (আশ্চর্যের কিছুই নেই) বাক্যাংশ উহ্য রয়েছে।

চার. আল্লাহ বলেন :

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

"যে জিব্রিলের শত্রু হবে, সে তো আল্লাহর নির্দেশে তা তোমার মনে নাযিল করেছে।" (বাকারা-৯৭)

আয়াতটি আসলে এমন ছিল :

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لَّهٗ، فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِهٖ ـ

www.pathagar.com

"যে জিব্রিলের শত্রু হবে আল্লাহ তার শত্রু। কেননা জিব্রিল তো তা আল্লাহর আদেশে তোমার মনে নাযিল করেছে।"

জিব্রিল তো আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতা। তার সাথে যে শত্রুতা রাখবে স্বভাবতই আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা রাখবেন। সুতরাং 'আল্লাহ তার শত্রু' অংশটুকু উহ্য আছে। আর পরবর্তী আয়াত– 'কেননা আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের শত্রু প্রমাণ করছে যে, এ অংশটুকু উহ্য রয়েছে।

অনির্ধারিত বিশেষ্যকে নির্ধারিত বিশেষ্য দ্বারা পরিবর্তন করা

কখনো আল্লাহ তা'আলা বাক্যের চাহিদা অনির্ধারিত বিশেষ্য (نَكِرَة) হওয়া সত্ত্বেও তাতে আলিফ-লাম যোগ করে বা তাকে অন্য কোন বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত (اضَافَة) করে তাকে নির্ধারিত (مَعْرِفَة) করে দেন। কিন্তু অর্থ বাক্যের চাহিদা অনুযায়ী অনির্ধারিতই (نَكِرَة) থেকে যায়। যেমন–

এক. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : وَقِيْلِهٖ يَا رَبِّ ـ

"আর তার একটি উক্তির কসম– হে আমার রব!" (যুখরুফ-৮৮)

এখন প্রশ্ন হলো এটা কেন করা হলো? আসলে এখানে قِيْلٌ لَهٗ হতো। এটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য قِيْلِهٖ উল্লেখ করা হয়েছে। যা معرفة বা নির্ধারিত। শব্দটি যদিও নির্ধারিত (مَعرفة) উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু অর্থ ঠিকই অনির্ধারিতই (نكرة) থাকবে। অর্থে কোন হেরফের হবে না।

দুই. আল্লাহ বলেন : حَقُّ الْيَقِيْنِ ـ - "একটি নিশ্চিত সত্য।"

বাক্যটি আসলে ছিল– حَقٌّ يَقِيْنٌ দু'টো বিশেষ্যই অনির্ধারিত অর্থ প্রকাশক বিশেষ্য ছিল। উচ্চারণ সহজ করার জন্য দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে আলিফ-লাম যোগ করে এবং প্রথম শব্দকে দ্বিতীয় শব্দের সাথে সম্বন্ধ করে নির্ধারিত (معرفة) করে দেয়া হয়েছে।

লিঙ্গ ও বচনে বিপরীতটি দ্বারা পরিবর্তন করা

কখনো দেখা যায় বাক্যের সাধারণ চাহিদা হলো সর্বনামটি (ضمير) পুংলিঙ্গ হোক বা স্ত্রী লিঙ্গ হোক, একবচন হোক, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সাধারণ রীতি থেকে বের হয়ে এসে পুংলিঙ্গের স্থলে স্ত্রী লিঙ্গ বা তার বিপরীত, একবচনের স্থলে বহুবচন উল্লেখ করে দেন। আর এটা করেন মর্মার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। যেমন

www.pathagar.com

এক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَا اَكْبَرُ ـ

"যখন সে সূর্যকে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উদিত হতে দেখল তখন বলল– এটা আমার রব। এটা সবচেয়ে বড়।" (আন'আম-৭৮)

আরবী ভাষায় "اَلشَّمْسُ" শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ। তাই দু'টো هٰذَا-ই পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত না হয়ে هٰذِهٖ স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহৃত হওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী লিঙ্গের স্থলে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করেছেন।

দুই. আল্লাহ বলেন : مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

"যালিম সম্প্রদায় থেকে।" (মুমিনুন-২৮)

এখানে ظَالِمٌ একবচন উল্লেখ না করে অর্থের দিকে বিবেচনা করে ظَالِمِيْنَ বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

তিন. আল্লাহ বলেন :

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ ـ

"তাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যে আগুন জ্বালালো, আগুন যখন তার চতুর্দিককে আলোকিত করল আল্লাহ তখন তাদের আলো দূর করে দিলেন।" (বাকারা-১৭)

এখানে اَلَّذِىْ শব্দের বিবেচনায় اسْتَوْقَدَ-তে একবচন উহ্য সর্বনাম (ضَمِيْر) ধরা হয়েছে। কিন্তু بِنُوْرِهِمْ-এর هُمْ বহুবচনের সর্বনাম (ضمير) ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ একবচন ব্যবহার করার কথা।

দ্বিবচনকে একবচন দ্বারা পরিবর্তন করা

আল্লাহ তা'আলা কখনো দ্বিবচনকে একবচন দ্বারা পরিবর্তন করেন। যেমন–

এক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

www.pathagar.com

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁদের দয়ায় ওদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছে।" (তওবা-৭৪)

এখানে আল্লাহ ও রাসূল উভয়ের জন্য مِنْ فَضْلِهٖ-তে সর্বনাম (ضمير)-টি 'هُمَا' দ্বিবচন ব্যবহার না করে 'هٖ' একবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

দুই. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ـ

"আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো স্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং যদি তিনি আমাকে তাঁর দয়ায় দান করে থাকেন আর তা তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়...।" (হূদ-২৮)

এখানে بَيِّنَةٌ ও رَحْمَةٌ উভয় শব্দের জন্য عُمِّيَتْ ক্রিয়াটিকে দ্বিবচনের পরিবর্তে একবচন উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে বাক্যাংশটি এমন হতো– عُمِّيَتَا عَلَيْكُمْ। যেহেতু بَيِّنَةٌ ও رَحْمَةٌ শব্দ দু'টো প্রায় একই তাই একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– প্রচলিত বাক্য– اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ ـ (আল্লাহ আর তার রাসূল ভাল জানেন।)

আল্লাহ ও রাসূল দু'টো আলাদা সত্তা হওয়া সত্ত্বেও বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে একই তাই اَعْلَمُ একবচন ব্যবহার করা একটা প্রসিদ্ধ রীতি।

শর্ত, শর্তের ফলাফল এবং কসম পরবর্তী বাক্যাংশকে স্বতন্ত্র বাক্যে পরিবর্তন করা

বাক্যের সাধারণ রীতির চাহিদা থাকে যে শর্তকে শর্তের আকারে, শর্তের ফলাফলকে তার নিজস্ব আকারে এবং কসম পরবর্তী বাক্যাংশকে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হোক। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসব বাক্যের মূল আকৃতি পরিবর্তন করে সেগুলোকে স্বতন্ত্র বাক্যের (مستانفه) রূপ দান করেন যেন অর্থ সুবিন্যস্ত হয় এবং উহ্য বাক্যটি কি ছিল তা স্পষ্ট বুঝা যায়। যেমন–

এক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

www.pathagar.com

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ، وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ، فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ، يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ـ

"কসম সেই ফেরেশতাদের যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে। কসম তাদের যারা (মুমিনদের) আত্মার বাঁধন খুলে দেয় আলতোভাবে। শপথ তাদের যারা সাঁতার কাটে দ্রুতগতিতে কসম তাদের যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং কসম তাদের যারা সব কাজ নির্বাহ করে। কিয়ামত অবশ্যই হবে। যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী।" (নাযিআত, ১-৬)

এর অর্থ হলো পুনরুত্থান ও হাশর সত্য। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ـ

("যেদিন কম্পনকারী প্রকম্পিত করবে।") আয়াতটি তারই প্রমাণ বহন করছে।

দুই. আল্লাহ বলেন :

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ، قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ ـ

"কসম গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের ও প্রতিশ্রুত দিবসের এবং সেই দিবসের যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়। অভিশপ্ত হয়েছে গর্তওয়ালারা।" (বুরূজ-১-৪)

এখানে পরপর কয়েকটি শপথসূচক বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কসমের আলোচ্য কথা (جواب قسم) উহ্য রাখা হয়েছে। আর তা হলো- اَلْمُجَازَاةُ عَلَى الْاَعْمَالِ حَقٌّ ـ অর্থাৎ "আমলের পুরস্কার দান করা একটি নিশ্চিত ব্যাপার।"

আর কসমের আলোচ্য কথার (جواب قسم) বদলে স্বতন্ত্র একটি বাক্য- قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন. আল্লাহ বলেন :

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ، وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ، وَاَلْقَتْ

www.pathagar.com

مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ، وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ـ

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও তার রবের আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত। হে মানুষ, তোমাকে তোমার রব পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। তারপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে।" (ইন্‌শিকাক-১-৬)

এখানে শর্ত কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তার ফলাফল (جزاء) উহ্য রাখা হয়েছে। তা হলো– اَلْحِسَابُ وَالْجَزَاءُ كَائِنٌ ـ

("মৃত্যুর পর হিসাব নেয়া হবে, প্রতিদান দেয়া হবে।")

এ বাক্যের স্থলে– .... يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ বাক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্বোধনসূচক শব্দের স্থলে অনুপস্থিতসূচক শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা

আল্লাহ তা'আলা কখনো হঠাৎ কথার ভঙ্গি পরিবর্তন করে দেন। বাক্যে সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহার করে কথা বলছেন, হঠাৎ আবার অনুপস্থিতসূচক (غائب) শব্দ উল্লেখ করে দেন। যেমন–

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ ـ

"এমনকি তোমরা যখন নৌকায় চড় এবং নৌকাগুলো তাদেরকে নিয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায়।" (ইউনুস-২২)

আয়াতের প্রথমে كُنْتُمْ (সম্বোধনসূচক) শব্দ বলেছেন। পরে আবার جَرَيْنَ بِهِمْ -এর মধ্যে هُمْ (অনুপস্থিতসূচক) শব্দ ব্যবহার করেছেন। আসলে جَرَيْنَ بِكُمْ হওয়াই যথাযথ ছিল। كُمْ-এর স্থলে هُمْ ব্যবহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

'খবর'সূচক[১] বাক্যাংশকে 'ইন্‌শা'সূচক বাক্য দ্বারা পরিবর্তন করা

আল্লাহ তা'আলা কখনো 'ইখবারের' স্থলে ইন্‌শাসূচক বাক্য এবং 'ইনশাসূচক বাক্যের' বদলে 'ইখবারসূচক বাক্য' ব্যবহার করেন। যেমন–

এক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا ـ

"তিনি ঐ সত্তা যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য সুগম করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা এর দিকে বিচরণ কর।" (সূরা মুলক-১৫)

আয়াতে فَامْشُوْا (انشاء)-এর স্থলে لِيَمْشُوْا (اخبار) বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়েছে।

দুই. আল্লাহ বলেন : اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

"যদি তোমরা ঈমানদার হও।" (বাকারা-৯১)

এই শর্তমূলক বাক্যটি (انشاء) ইখবারসূচক বাক্য– اِيْمَانُكُمْ يَقْتَضِىْ هٰذَا -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হলো– 'তোমাদের ঈমানের চাহিদাই তো এটা।'

তিন. مِنْ اَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ـ

"এ কারণেই আমি ইসরাঈলের প্রতি বিধান আরোপ করেছি।" (মায়িদা-৩২)

এখানে مِنْ اَجْلِ ذَالِكَ (এ কারণেই) বাক্যাংশটি عَلٰى قِيَاسِ حَالِ اِبْنِ اٰدَمَ (আদম সন্তানের অবস্থা বিবেচনা করে) অথবা عَلٰى مِثَالِ حَالِ اِبْنِ اٰدَمَ (আদম সন্তানের অবস্থার মত)-এর স্থলে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত 'কিয়াস' বা তুলনা কোন কারণকে ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। সেসব বলা হলে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তা থেকে বেঁচে বাক্য সংক্ষেপ করার জন্যেই এমনটি করা।

চার. আল্লাহ বলেন :

أَرَاَيْتَ তুমি কি দেখেছ?

---

১. যে কথায় সত্য-মিথ্যা উভয়টির সম্ভাবনা থাকে তাকে খবরসূচক বাক্য বলে (اخبار)। আর যে কথায় সত্য বা মিথ্যা কোনটারই সুযোগ নেই, তাকে ইন্‌শাসূচক বাক্য বলে।

www.pathagar.com

বাক্যটি প্রশ্নবোধক, তাই ইন্‌শাসূচক। এ ইন্‌শাসূচক বাক্যটি পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় খবরসূচক বাক্যের আকারে ব্যবহৃত হয়েছে–

اَنَا اُنَبِّئُكَ "আমি তোমাকে অবহিত করছি।" -এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাক্যটি পরবর্তী কথার প্রতি শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলা হয়েছে। যেমন– বলা হয়ে থাকে– تَرٰى شَيْئًا 'কিছু কি দেখেছ?' تَسْمَعُ شَيْئًا (কিছু কি শুনেছ?)

বাক্যে আগ-পিছ করা

বাক্য বিন্যাসে কখনো আগের অংশ পরে এবং পরের অংশ আগে স্থানান্তর করা হয়। এতে করে মূলকথা অনুধাবন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

যেমন প্রসিদ্ধ আরবী কবিতার দু'টো চরণ লক্ষণীয় :

بُثَيْنَةُ شَأْنُهَا سَلَبَتْ فُؤَادِىْ + بِلاَ جُرْمٍ اَتَيْتُ بِهٖ سَلاَمًا ـ

"বুসাইনার কামনীয় ভঙ্গি আমার মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে, আমার কোন অপরাধ ছাড়াই।"

এখানে سَلاَمًا ও فُؤَادِىْ পাশাপাশি উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। আর سَلاَمًا -এর পরে بِلاَ جُرْمٍ اَتَيْتُ بِهٖ উল্লেখ থাকার নিয়ম। কিন্তু এমন না হওয়াতে চরণ দু'টোর অর্থ বুঝা কঠিন হয়ে গেছে।

শব্দগুলোর দূর সম্পর্ক

কখনো একটি শব্দের সম্পর্ক দূরের কোন শব্দের সাথে যুক্ত হয়। ফলে বাক্যটির অর্থ বুঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন আরো অনেক অবস্থা রয়েছে যদ্বরুন আয়াতের মর্মার্থ বুঝা কঠিন হয়ে যায়। যেমন– বাক্যে বারবার لاَ ব্যবহার করা।

এক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاَجَلٌ مُّسَمًّى ـ

"যদি তোমাদের ভাগ্য আগে নির্ধারিত না হতো ও একটা নির্ধারিত সময় না থাকতো তাহলে নিশ্চিত শাস্তি হতো।" (তোয়াহা-১২৯)

আয়াতটি আসলে এমন হওয়া প্রয়োজন ছিল :

www.pathagar.com

وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ وَاَجَلٌ مُسَمًّى لَكَانَ لِزَامًا ـ

দুই. আল্লাহ বলেন : يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ـ

"তারা তোমাকে (কিয়ামত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি যেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী।" (আ'রাফ-১৮৭)

আসলে আয়াতটি এমন হওয়া উচিত ছিল : يَسْئَلُوْنَكَ عَنْهَا كَاَنَّكَ حَفِىٌّ ـ

عَنْهَا অংশটি পরে আসায় মর্মার্থে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

তিন. আল্লাহ বলেন : فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ـ

"তাহলে কোন জিনিস তোমাকে পরকালের ব্যাপারে অবিশ্বাসী করেছে?" (তীন-৭)

আয়াতটি সূরার চতুর্থ আয়াত। আর সপ্তম আয়াত :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ـ

(অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি)-এর সাথে সম্পৃক্ত, অথচ মাঝখানে দু'টো আয়াত রয়েছে।

চার. আল্লাহ বলেন :

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

"তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। আর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা টাখনু পর্যন্ত (ধৌত করবে)।"

আয়াতের اَرْجُلَكُمْ অংশটি اِغْسِلُوْا-এর সাথে সম্পৃক্ত। وَامْسَحُوْا-এর সাথে নয়।

পাঁচ. আল্লাহ বলেন :

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ..... اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ـ

www.pathagar.com

"আর দ্বীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য..... যদি তোমরা তা না কর, তাহলে পৃথিবীতে ফিত্না ও মহাবিপদ দেখা দেবে।" (আনফাল-৭৩)

এখানে اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ অংশটুকুর সম্পর্ক اَلنَّصْرُ فَعَلَيْكُمُ অংশের সাথে।

ছয়. আল্লাহ বলেন :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا ... اِلاَّ قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ ـ

"তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যখন তারা বলেছেন, ...তবে ব্যতিক্রম নিজ পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তি।" (মুমতাহিনা-৪)

এখানে "اِلاَّ قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ" -এর সম্পর্ক পূর্ববর্তী আয়াতাংশ... قَدْ كَانَتْ لَكُمْ ... اُسْوَةٌ -এর সাথে। মাঝে দূরত্ব অনেক।

সাত. আল্লাহ বলেন : اِلاَّ اٰلَ لُوْطٍ. اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ، اِلاَّ امْرَاَتَهٗ ـ

এখানে একটি ইস্তিস্নাকে[১] আরেকটি ইস্তিসনার পর উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ :

"কিন্তু লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়। আমি অবশ্যই সবাইকে হিফাযত করব, কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়।" (হিজর-৫৯-৬০)

আল্লাহ বলেন : يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ـ

"সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকারের চাইতে নিকটতর।" (হজ্জ-১৩)

এখানে مَنْ-এর শুরুতে "ل" যোগ করাতে অর্থের দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

নয়. আল্লাহ বলেন : مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ـ

১. একটি কথা বলে বাক্যের মধ্যেই সে কথার ব্যতিক্রমী কিছু উল্লেখ করাকে ইস্তিস্না বলে। যেমন– যায়েদের পরিবার এসেছিল কিন্তু উমর আসেনি। এখানে উমরের ব্যাপারটি ব্যতিক্রম।

www.pathagar.com

"যার (ধন ভাণ্ডারের) চাবিসমূহ নিয়ে একদল শক্তিশালী লোক ক্লান্ত হয়ে পড়ে।" (কসাস-৭৬)

এখানে "ب" অব্যয়টি عُصْبَةَ শব্দের শুরুতে যোগ করা হয়েছে অথচ عُصْبَةُ أُولُوا الْقُوَّةِ بِهَا এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক নিয়ম সিদ্ধ ছিল।

অতিরিক্ত শব্দ বা বাক্য ব্যবহার

পবিত্র কুরআনে কোথাও কোথাও বিশেষ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা অতিরিক্ত শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করেছেন।

অতিরিক্ত শব্দ বা বাক্য ব্যবহার কয়েক ধরনের :

১. গুণবাচক শব্দ (صفة) বৃদ্ধি করে।

২. বিকল্প বাক্যাংশ (بدل) বৃদ্ধি করে।

৩. ব্যাখ্যামূলক বাক্যাংশ (عطف تفسيرى) বৃদ্ধি করে।

৪. শব্দ বা বাক্য পুনরাবৃত্তি (تكرار) করে।

৫. যের প্রদানকারী অব্যয় (حرف جر) বৃদ্ধি করে।

৬. দু'টো বাক্যের মাঝে واو বা فاء বৃদ্ধি করে।

১. অতিরিক্ত গুণবাচক শব্দ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلاَ طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلاَّ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ـ

"আর নিজের পাখা মেলে এমন কোন পাখি উড়ে না যা তোমাদের মতো একেকটি উম্মত নয়।" (আন'আম-৩৮)

এখানে يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ অংশটি طَائِرٌ-এর গুণবাচক অংশ (صفة)। যা বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত।

২. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۙ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۙ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ـ

www.pathagar.com

"মানুষকে অস্থিরচিত্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন তাকে বিপদে পায় সে হা-হুতাশকারী হয়ে যায়। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে অতি কৃপণ হয়ে যায়।" (মা'আরিজ-১৯-২১)

এখানে إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটি هَلُوْعًا (অস্থিরচিত্ত)-এর গুণবাচক বাক্যাংশ, যা মূল বক্তব্যের অতিরিক্ত।

২. বিকল্প বাক্যাংশ (بدل) বৃদ্ধি করা

বাক্যে কখনো বিকল্প বাক্যাংশ (بدل) বৃদ্ধি করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ ـ

"তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল সেই নিরীহ লোকদেরকে।" (আ'রাফ-৭৫)

এ আয়াতে لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ (যারা ঈমান এনেছে) অংশটি (সেই নিরীহ লোক)-এর বিকল্প বাক্যাংশ বা بدل যা মূল বক্তব্য থেকে অতিরিক্ত।

৩. ব্যাখ্যামূলক বাক্যাংশ (عطف تفسيرى) বৃদ্ধি করা

বাক্যে কখনো ব্যাখ্যামূলক শব্দাবলী বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত রূপ দেয়া হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : حَتّٰى إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ـ

"এমনকি যখন সে পরিপক্কতার বয়সে পৌঁছল এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হলো।" (আহকাফ-১৫)

এখানে وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً (এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হলো) বাক্যাংশটি আগের বাক্যাংশেরই ব্যাখ্যা এবং মূল বক্তব্যের অতিরিক্ত।

৪. পুনরুক্তির মাধ্যমে (تكرار) বাক্যাংশ বৃদ্ধি করা

বাক্য বা বাক্যাংশ বারবার উল্লেখ করে অতিরিক্ত রূপ দেয়া হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ـ

www.pathagar.com

"যারা অনুসরণ করে তাদের, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে শরীক হিসেবে ডাকে, তারা শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে।" (ইউনুস-৬৬)

এখানে مَا يَتَّبِعُوْنَ (যারা অনুসরণ করে) অংশটি اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ (তবে তারা অনুসরণ করে) অংশটিরই পুনরুল্লেখ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ـ

"তাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক হিসেবে আল্লাহর কাছ থেকে যখন কিতাব আসল আর তারা আগে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে এর সাহায্য প্রার্থনা করত, তারা জানত তা যখন তাদের কাছে আসল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল।" (বাকারা-৮৯)

এ আয়াতে وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ অংশটি فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ-এর পুনরুল্লেখ। কারণ مَا عَرَفُوْا বাক্যাংশ দ্বারা كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ বুঝানো হয়েছে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ ـ

"তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পরে দুর্বল-অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্য তারাও আশংকা করে, সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে।" এ আয়াতে فَلْيَتَّقُوْا অংশটুকু আগের وَلْيَخْشَ অংশেরই পুনরাবৃত্তি। কারণ দু'টোই একই অর্থের দুই শব্দ।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ـ

www.pathagar.com

"তারা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।" (বাকারা-১৮৯)

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন চাঁদ মানুষের জন্য সময় নির্দেশক এবং হজ্জের সময় নির্ধারণের জন্য নির্দেশক। শুধু সময় নির্দেশক বললেই তো হজ্জও তার অন্তর্ভুক্ত হতো। সুতরাং আলাদাভাবে হজ্জের উল্লেখ করাটা পুনরাবৃত্তি। সুতরাং হজ্জ অংশটি আয়াতের মূল বক্তব্যের অতিরিক্ত। যদি এভাবে বলা হতো :

هِيَ مَوَاقِيْتٌ لِلنَّاسِ فِيْ حَجِّهِمْ ـ

"চাঁদ মানুষের জন্য তাদের হজ্জের সময় নির্দেশক" তাহলে সংক্ষেপেই উদ্দেশ্য হাসিল হতো।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ـ

"যেন তুমি সমবেত হওয়ার দিন (কিয়ামতের দিন) সম্পর্কে মক্কা ও তার আশ-পাশের মানুষকে সতর্ক করতে পার।" (শূরা-৭)

এ আয়াতে تُنْذِرَ শব্দটি (فعل) পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াত আসলে এমন :

لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ـ

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ـ

"তুমি পর্বতমালাকে স্থির মনে করেছ।" (নমল-৮৮)

আয়াতে تَحْسَبُهَا অংশটির অর্থ আর تَرَى الْجِبَالَ-এর অর্থ একই। সুতরাং এটা পুনরাবৃত্তি। رُؤْيَةٌ (দেখা) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে একটি অর্থ হলো حِسْبَانٌ (মনে করা)। আর تَحْسَبُ অর্থও 'মনে করা'। সুতরাং ক্রিয়া দু'টো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা পুনরাবৃত্তি।

www.pathagar.com

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ ص وَمُنْذِرِيْنَ

وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط

وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا

بَيْنَهُمْ، فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

"মানুষ ছিল একই জাতি। তারপর আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আর তাদের কাছে সত্যসহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যেন তারা মানুষের মতবিরোধপূর্ণ ব্যাপারে মীমাংসা করতে পারেন। যাদেরকে তা (কিতাব) দেয়া হয়েছে তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসা সত্ত্বেও পরস্পর বিদ্বেষের কারণে শুধু তারাই মতানৈক্য করেছে। আল্লাহ তাঁর দয়ায় মুমিনদেরকে সে ব্যাপারে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।" (বাকারা-২১৩)

এ আয়াতে وَمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ অংশটুকু আগের اِخْتَلَفَ অংশেই পুনরাবৃত্তি।

আল্লাহ তা'আলা এই বাড়তি অংশটি এমন এক আলোচনার মধ্যে রেখেছেন, যার একটি অংশ অপর অংশের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ مِنْ بَعْدِ থেকে بَيْنَهُمْ পর্যন্ত অংশটি اِخْتَلَفُوْا শব্দের (فعل)-এর সাথে জড়িত।

এই পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য হলো–

১. اِخْتَلَفُوْا-এর কর্তাকে স্পষ্ট করে দেয়া।

২. اِخْتِلاَفْ বা অনৈক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ কিতাব নাযিল হওয়ার পর যাদের প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছে তাদের মতবিরোধ। তাদের একদল তো কিতাব ও নবীর প্রতি ঈমান এনেছে। আরেক দল নবী ও কিতাবকে অস্বীকার করেছে।

www.pathagar.com

যের প্রদানকারী অব্যয় বৃদ্ধি করা

আল্লাহ তা'আলা কখনো সম্পর্ক জোরদার করার জন্য কর্তা (فاعل) বা কর্মের (مفعول به) শুরুতে যের প্রদানকারী অব্যয় বৃদ্ধি করেন।

যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ـ

"যেদিন তা (জমানো ধনসম্পদ) জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে।" (তাওবা-৩৫)

আয়াতের هَا সর্বনামটি দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াত :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ـ

"যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে রাখে" বুঝানো হয়েছে। আয়াতের মূলরূপ এমন ছিল :

يَوْمَ تُحْمٰى هِىَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ـ

يَوْمَ يُحْمٰى هِىَ সর্বনামের শুরুতে عَلٰى যের প্রদানকারী সর্বনাম বৃদ্ধি করাতে عَلَيْهَا রূপ ধারণ করে।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ـ

"আমি মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে তাঁদের পদাংক অনুসরণ করিয়েছি।" (মায়িদা-৪৬)

এখানে اٰثَارِهِمْ-এর পূর্বে عَلٰٓى বৃদ্ধি করা হয়েছে। আয়াতের মূলরূপ ছিল–

وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ اٰثَارَهُمْ ـ

وَاوْ এবং فَاء বৃদ্ধি করা

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় জেনে রাখা উচিত। আর তা হলো– واو হরফটি কখনো 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে সম্পর্ক ও যোগসূত্র জোরদার করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۙ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۛ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۙ اِذَا رُجَّتِ

www.pathagar.com

الْاَرْضُ رَجًّا ۙ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۙ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۙ وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۔

"যখন কিয়ামত ঘটবে, তার সংঘটন অস্বীকার করার কেউ থাকবে না। তা একদলকে নীচু করবে, আরেক দলকে করবে উঁচু। যখন প্রবল কম্পনে পৃথিবীকে প্রকম্পিত করা হবে। আর পাহাড়সমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। ফলে তা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় রূপান্তরিত হবে। তখন তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হবে।" (ওয়াকিয়া-১-৭)

আয়াতটিতে كُنْتُمْ-এর পূর্বের وَاوْ হরফটিকে আগের বক্তব্যের সাথে পরের বক্তব্যের সম্পর্ক জোরদার করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا ۔

"অবশেষে যখন তারা (দোযখের) কাছে উপস্থিত হবে, তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে।" (যুমার-৭৩)

"এখানে وَاوْ হরফটিকে তার পূর্বাপর সম্পর্ক জোরদার করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।"

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۔

"যেন আল্লাহ মুমিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন।" (আলে ইমরান-১৪১)

এখানে وَاوْ হরফটি পূর্বাপর সম্পর্ক জোরদার করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

একইভাবে فَاء হরফও বৃদ্ধি করা হয়।

আল্লামা কুস্তালানী (র.) বুখারী শরীফের 'হজ্জ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন যে, উমরার নিয়ত করে উমরা শেষ করে যদি মক্কা শরীফ ছেড়ে চলে তখন বিদায়ী তাওয়াফ জরুরী কিনা? এখানে তিনি প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন, যদি গুণবাচক বাক্যের গুণ (صفة) ও যার গুণ বর্ণনা করা হলো (موصوف) তার মধ্যে সম্পর্ক জোরদার

www.pathagar.com

করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে দু'য়ের মাঝে সংযোজক অব্যয় (حرف عطف) ব্যবহার করা যায়। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ـ

"যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরোগ আছে তারা বলে।" (আনফাল-৪৯)

এখানে 'মুনাফিক' ও 'যাদের অন্তরে রোগ আছে' বলে একই মানুষ বুঝানো হয়েছে (صفة ـ موصوف)। মাঝে وَاوْ ব্যবহার করে সম্বন্ধ জোরদার করা হয়েছে।

বিখ্যাত আরবী ব্যাকরণবিদ আল্লামা সিংওয়াই (র.) (১৪৮-১৮০ হি.) বলেন– এ আয়াতটি ঠিক নীচের বাক্যটির মতো :

مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَصَاحِبِكَ ـ

"আমি তোমার বন্ধু যায়েদের সাথে গিয়েছিলাম।"

এখানে 'তোমার বন্ধু' ও 'যায়েদ' একই ব্যক্তি। কিন্তু উভয়ের মাঝে وَاوْ হরফটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) নিম্নের আয়াত সম্পর্কে বলেন :

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ـ

"আমি যে অঞ্চলকেই ধ্বংস করেছি, তার জন্য ছিল একটি নির্ধারিত লিখিত সময়।" (হিজ্‌র-৪)

এখানে وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ অংশটুকু قَرْيَةٌ শব্দের গুণবাচক বাক্যাংশ (صفة)। যুক্তি সংগত হতো যদি এতদুভয়ের মাঝে وَاوْ উল্লিখিত না হতো। যেমন নীচের আয়াতে وَاوْ উল্লিখিত হয়নি :

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ ـ

"আমি এমন কোন অঞ্চল ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না।" (শুয়ারা-২০৮)

www.pathagar.com

কিন্তু প্রথম আয়াতে মাঝখানে وَاوْ হরফ বৃদ্ধি করা হয়েছে দু'য়ের সম্বন্ধ জোরদার করার জন্য। এটা ঠিক অবস্থা বর্ণনার (حال) জন্য ব্যবহৃত وَاوْ-এর মত।

অবস্থা বর্ণনার উদাহরণ হলো– جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ ـ

"যায়েদ এ অবস্থায় এসেছে যে, তার গায়ে কাপড়।"

এখানে وَاوْ বৃদ্ধি না করলে বাক্যটি এমন হতো, جَاءَنِىْ زَيْدٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ـ

সর্বনাম (ضمير) ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার দরুন তার অর্থ বুঝা কঠিন হয়ে যায়।

আবার কখনো একটি শব্দের একাধিক অর্থ প্রকাশ করায়ও অর্থ দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ـ

"আর নিশ্চয় তারা তাদের সঠিক পথ থেকে বিরত রাখে আর তারা ভাবে যে, তারাই সুপথ প্রাপ্ত।" (যুখরুফ-৩৭)

এ আয়াতে পাঁচটি সর্বনাম (ضمير) ব্যবহৃত হয়েছে। هُمْ তিনবার এবং يَصُدُّوْنَ ও يَحْسَبُوْنَ-এর কর্তাদ্বয়। প্রথম দু'টো সর্বনাম দ্বারা 'শয়তান' উদ্দেশ্য আর বাকীগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য 'মানুষ'।

সুতরাং আয়াতের মূলরূপ হবে–

وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيَصُدُّوْنَ النَّاسَ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُ النَّاسُ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ـ

অর্থাৎ– "নিশ্চয় শয়তানরা মানুষকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে, তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে।"

একই শব্দের একাধিক অর্থ প্রকাশ করা

কখনো আবার একই শব্দ দ্বারা একাধিক অর্থ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, আল্লাহ বলেন : قَالَ قَرِيْنُهٗ ـ – "তার সঙ্গী বলবে।"

قَرِيْنٌ শব্দের অর্থ সঙ্গী। সূরা ক্বফ-এর ২৩ নম্বর আয়াতে 'ফেরেশতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার একই সূরার ২৭ নম্বর আয়াতে 'শয়তান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

স্থানভেদে অর্থের ভিন্নতার সম্ভাবনা রাখে এমন শব্দের অর্থ অনুধাবনও জটিলতা সৃষ্টি হয়।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ـ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ..... ـ

"তারা কী ব্যয় করবে! এ সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় করবে পিতামাতা... এর জন্য।" (বাকারা-২১৫)

তেমনি অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ـ قُلِ الْعَفْوَ ـ

"তারা কী ব্যয় করবে, সে সম্পর্কে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, বল, যা উদ্বৃত্ত।" (বাকারা-২১৯)

প্রথম আয়াতে প্রশ্নের উদ্দেশ্য ব্যয়ের খাত সম্পর্কে জানা। আর দ্বিতীয় আয়াতে প্রশ্নের উদ্দেশ্য কোন প্রকারের সম্পদ ব্যয় করবে? তা জানা।

جَعَلَ ও شَيْئٌ শব্দাবলী বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়

ঠিক তেমনি কুরআন মজীদে جَعَلَ ও شَيْئٌ শব্দগুলোকে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

جَعَلَ শব্দটি (فعل) কখনো خَلَقَ (সৃষ্টি করেছেন) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেন : جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ ـ

"তিনি অন্ধকারসমূহ ও আলো সৃষ্টি করেছেন।" (আনআম-১)

আবার কখনো اِعْتَقَدَ (বিশ্বাস করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ বলেন : وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا ـ

"আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে এক অংশ তারা আল্লাহর জন্য বিশ্বাস করে।" (আনআম-১৩৬)

এখানে جَعَلُوْا অর্থ বিশ্বাস করে। তেমনি شَيْءٌ শব্দটিও কর্তা (فاعل) এবং বিভিন্ন কর্মের (مفعول) স্থলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন-

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ বলেন : اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ـ

"তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে?" (তূর-৩৫)

এখানে شَيْءٌ শব্দটি কর্তার (فَاعِلٌ) স্থলে 'স্রষ্টা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَلاَ تَسْئَلْنِىْ عَنْ شَيْئٍ ـ

"তবে (আমার ব্যাপারে) কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না।" (কাহাফ-৭০)

এখানে شَيْءٌ শব্দটি কর্মের (مفعول به) স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

তেমনি অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ـ

"তারা কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (আলে ইমরান-১৭৬)

এখানে شَيْئًا শব্দটি ضَرَرًا অর্থে কর্মের (مفعول مطلق) স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

কখনো اَلْاَمْرُ، اَلنَّبَأُ، اَلْخَطْبُ শব্দগুলো ব্যবহার করে ঘটনা বুঝানো হয়। যেমন- قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيْمٌ ـ – "বল, তা এক বিরাট ঘটনা।" (সায়াদ-৬৭)

তেমনিভাবে شَرٌّ ও خَيْرٌ এবং তার একই অর্থবিশিষ্ট শব্দের উদ্দেশ্য ও স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই এরও অর্থ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায়।

আয়াত বিক্ষিপ্ত হওয়া

আয়াত বিক্ষিপ্ত হলেও মর্মার্থ বুঝা কঠিন হয়ে যায়। কোন আয়াত এমন যে তা ঘটনার শেষে আসার কথা। অথচ আগেই এসে গেছে। তারপর আবার নতুনভাবে ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। (যেমন-কসাস-৭৮)

কখনো কোন আয়াত নাযিল হিসেবে আগে হলেও তিলাওয়াতের সময় পরে আসে। এতে অর্থ নির্ণয় করা কঠিন হয়। যেমন : قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ ـ

"অবশ্যই আমি তোমার বারবার তাকানো লক্ষ্য করেছি।" (বাকারা-১৪৩)

www.pathagar.com

এ অংশটি আগে নাযিল হয়েছে এবং سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ (শীঘ্রই মূর্খরা বলবে) (বাকারা-১৪২) আয়াতটি পরে নাযিল হয়েছে। অথচ তিলাওয়াতের সময় তার বিপরীত তিলাওয়াত করতে হয়।

কখনো এমন দেখা যায়, কাফিরদের বক্তব্য উপস্থাপনের ফাঁকে ফাঁকে তার জবাবও দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এভাবে প্রশ্নোত্তর করে এলোমেলোভাবে আয়াত শেষ হয়েছে। এতেও দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ط قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ لا اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ ـ

"আর যারা তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করেছে তাদের ছাড়া অন্য কারো সম্পর্কে বিশ্বাস করবে না। বল, আল্লাহর হিদায়াতই একমাত্র নির্দেশনা যে, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার মত অন্যকেও দেয়া হবে।" (আলে ইমরান-৭৩)

এ আয়াতে قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ অংশটুকু কাফিরদের বক্তব্যের জবাব। এজন্য এটা পরে উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাক্যটি বক্তব্যের মাঝখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোটকথা, এ বিষয়গুলো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। এ পর্যন্ত যেটুকু ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা মোটামুটি যথেষ্ট। সৌভাগ্যবান তারাই যারা কুরআন তিলাওয়াতের সময় এগুলো স্মরণ রাখবে। ফলে তারা একটু চিন্তা করলেই আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হবে। উল্লিখিত দু'য়েকটি উদাহরণের সাথে তুলনা করলে অনুল্লিখিত বিষয়গুলোও বুঝতে সক্ষম হবেন। (ইন্‌শাআল্লাহ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুহকাম, মুতাশাবিহ, কিনায়া, তা'রীয, মাজাযে আক্‌লীর আয়াতসমূহ

কুরআনুল কারীমে দু'ধরনের আয়াত রয়েছে। 'মুহ্‌কাম' ও 'মুতাশাবিহ'। মুহকাম বলা হয়, এমন সব আয়াত যার অর্থ বুঝতে কোন আরবী ভাষাবিদের দ্বিধা হয় না অর্থাৎ সুনির্ধারিত ও স্পষ্ট একটি অর্থ বুঝতে পারে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক আরব জাতির অনুধাবনকৃত অর্থই গ্রহণযোগ্য। এ যুগের ঐসব গবেষকদের অনুধাবন গ্রহণযোগ্য নয়, যারা গবেষণার দাপটে চুলচিরে ভাগ-ভাগ করার মত সূক্ষ্ম বিচার

www.pathagar.com

করে। আসলে অসার গবেষণা একটি দূরারোগ্য ব্যাধি। এ ব্যাধি ও বিকৃত মানসিকতা 'মুহকাম'কে 'মুতাশাবিহ' আর 'মুতাশাবিহ'কে মুহকাম বানিয়ে দেয়।

মুতাশাবিহ

মুফাস্‌সির আলিমগণের মতে 'মুতাশাবিহ' হলো– একাধিক অর্থবহ শব্দ ও বাক্য অর্থাৎ এমন শব্দ ও বাক্য যার দুই বা ততোধিক অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অনেকগুলো কারণে تَشَابُه বা একাধিক অর্থ জন্ম দেয়। এখানে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো :

এক. সর্বনামের (ضَمِيْر) কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য একাধিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে।

যেমন কেউ বলল :

জান? শাসক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন অমুককে লা'নত করি। আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করুন।

এ বাক্যটিতে 'তাকে' সর্বনামটি দ্বারা 'অমুক' উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনাও আছে, তেমনি 'তাকে' দ্বারা 'শাসক'ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

দুই. বাক্যে এমন শব্দ ব্যবহৃত হলে, যার একাধিক অর্থ হতে পারে। যেমন– আল্লাহ বলেন : اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ ـ

এখানে لَامَسَ শব্দটির (فعل) দু'টো অর্থ হতে পারে। 'সহবাস' ও 'হাতের স্পর্শ'। প্রথম অর্থ হিসেবে বাক্যটির অর্থ হবে– অথবা তোমরা নারীদের সঙ্গে সহবাস করেছ। দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে অর্থ হবে– অথবা তোমরা নারীদেরকে হাত দ্বারা স্পর্শ করেছ।

তিন. নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয় বিশেষ্যের সাথে সম্বন্ধ (عَطْف) হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

আয়াতের اَرْجُلِكُمْ-এর ل অক্ষরে যবর ও যের উভয়ভাবেই পড়া যায়। যবর হলে তার সম্বন্ধ (عطف) হবে وُجُوْهَكُمْ-এর সাথে। আর যের হলে তার সম্বন্ধ হবে رُؤُوْسِكُمْ-এর সাথে। এতে অর্থে অনেক তফাত সৃষ্টি হবে।

www.pathagar.com

চার. কোন বাক্যে দু'টো অংশ সম্বন্ধসূচক বা একই বাক্যে আলাদা আরেকটি নতুন বাক্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ـ

আয়াতে وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ অংশটিতে দু'টো সম্ভাবনা আছে।

(ক) হয়তো তা আল্লাহ শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত (عطف) যদি তাই হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে–

"আল্লাহ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি সব কিছু আমাদের রবের কাছ থেকে আগত।" (আলে ইমরান-৭)

(খ) اَلرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ অংশটুকু নতুন বাক্য (مُسْتَانِفَةٌ) তখন আয়াতের অর্থ হবে– "আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তার ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে– আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। সবকিছু আমাদের রবের কাছ থেকে আগত।"

'কিনায়া' বা ইঙ্গিত

একটি কথা বলে অন্য অর্থের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা, যা ব্যবহৃত শব্দের অনিবার্য অর্থ দাঁড়ায়। অনিবার্য অর্থ আবার দু'ধরনের হতে পারে, একটি হলো স্বাভাবিক। আরেকটি হলো– যুক্তিভিত্তিক। যেমন– رَاَشِدٌ عَظِيْمُ الرَّمَادِ ـ

"রাশেদ বিশাল ছাইয়ের স্তূপের অধিকারী।"

এখানে বাক্যটির এ শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং এর অনিবার্য অর্থ– 'অধিক অতিথিপরায়ণ'-এর দিকে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য, আল্লাহ বলেন : بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ ـ

"বরং তার হস্তদ্বয় প্রসারিত।" (মায়িদা-৬৪)

কিন্তু আয়াতটি এখানে 'আল্লাহ মহান দানশীল' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও 'কিনায়া' বা 'ইঙ্গিত'-এর রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

কাঙ্ক্ষিত অর্থকে উপমার আকারে চিত্রায়ণ

কাঙ্ক্ষিত ভাবকে উপমার মত করে বর্ণনা করাও ইঙ্গিত রীতির অন্তর্ভুক্ত। এ রীতিটি আরবদের কবিতায়, বক্তৃতায় এবং কুরআন হাদীসে প্রচুর দেখা যায়।' যেমন-

শয়তান আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হয়ে আদম সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প ব্যক্ত করার জবাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :

اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآئُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ـ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ـ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلاً ـ

"যা (দেখি তোর কী শক্তি আছে।) তারপর তাদের থেকে কেউ তোর অনুগামী হলে জাহান্নামই হবে তোদের শাস্তি, পরিপূর্ণ প্রতিফল। তুই তাদের থেকে যাকে পারিস নিজের আওয়াজ দিয়ে (প্ররোচনা, গান বাদ্য ইত্যাদি) দিয়ে উত্তেজিত কর, তাদের বিরুদ্ধে তোর অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা অভিযান চালা। (আল্লাহর অবাধ্য জীন ও মানুষ শয়তানের বাহিনী) তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্তাদিতে শরীক হয়ে যা। তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি প্রবঞ্চনা মাত্র। যারা আমার বান্দা তাদের উপর তোর কোন কর্তৃত্ব নেই। কর্ম বিধায়করূপে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।" (বনী ইসরাঈল-৬৩-৬৫)

আয়াত দু'টোতে শয়তানকে ডাকাত দলের প্রধান হিসেবে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। লোকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে সে তার বাহিনীকে আহ্বান করছে এদিক দিয়ে আস! ঐ দিকে ঢুকে পড়! শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণার ব্যাপারটিকে কী চমৎকার উপমার আকারে উপস্থাপন করা হলো।

এমনই আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلاً فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ـ ـ

"আমি তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি যা রয়েছে তাদের চিবুক পর্যন্ত ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।" (ইয়াসীন-৮)

www.pathagar.com

আয়াতটি পড়লেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে– কিছু লোককে গলায় বেড়ি লাগিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের মাথা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। ফলে তারা এদিক-ওদিক তাকাতেও পারছে না। যেসব কাফিররা আল্লাহবিমুখ হয়ে জীবন চলেছে তার পরিণতির একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ ـ

"আমি তাদের সামনে একটি দেয়াল ও পেছনে একটি দেয়াল স্থাপন করেছি। তাদের চোখের সামনে পর্দা ফেলে আবৃত করে দিয়েছি। ফলে তারা দেখতে পাচ্ছে না।" (ইয়াসীন-৯)

এ আয়াতটিতেও আল্লাহবিমুখ কাফিরদের অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কতক লোককে দেয়ালের বেষ্টনির মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে। ফলে তারা চতুর্দিকের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এসব উদাহরণগুলোতে আল্লাহ তা'আলা ভাষার গাঁথুনি দিয়ে অদৃশ্য একটি অবস্থাকে দৃশ্যমান করে ফুটিয়ে তুলে দেন।

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ـ

"ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় বুকে চেপে ধর।" (সূরা কসাস-৩২)

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে নিশ্চিন্ত থাকার জন্য এ অভয়বাণী শুনিয়ে দিলেন। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ হলো দুশ্চিন্তা ও ভয় বর্জন করুন। শান্ত থাকা এটা মনের ব্যাপার। প্রশান্ত চিত্ত থাকার জন্য 'বুকে হাত চেপে ধরার' মত দৃশ্যমান প্রকাশ ভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে।

আরবী পরিভাষায় এর উদাহরণ

এতক্ষণ কুরআন মাজীদ থেকে উপমা অবলম্বনে ভাব প্রকাশের রীতির কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো। এখন দেখা যাক আরববাসীরা তাদের পরিভাষায় এটাকে কিভাবে ব্যবহার করত?

১. যখন কেউ তার বীরত্ব প্রকাশের ইচ্ছা করত, তখন তরবারী হাতে ইশারা করত আর বলত– আমি এভাবে মারি ওভাবে মারি, উদ্দেশ্য হলো তার বীরত্বের প্রভাব সবার উপর প্রভাবশালী করে তোলা। কেউ যেন তার সামনে টিকে থাকতে পারবে না। যদিও লোকটি জীবনে কখনো তরবারী হাতে নিয়ে দেখেনি।

www.pathagar.com

২. অনেক মানুষকে বলতে শোনা যায়– অমুক বলে যে, আমি পৃথিবীতে এমন কাউকে দেখি না যে, সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে! যদিও সে কখনো তা বলেনি।

৩. প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার সময় বীর যোদ্ধাদের বিজয়সুলভ অঙ্গ-ভঙ্গি করে অনেকে বলে থাকে– 'অমুক এমন করে'। যদিও তিনি কখনো এমন অঙ্গ-ভঙ্গি করেননি।

৪. অনেকে বলে থাকে, 'অমুক আমার গলা টিপে ধরেছে' এবং আমার মুখ থেকে লোকমা ছিনিয়ে নিয়েছে।

তা'রীয বা পরোক্ষ ইঙ্গিত

অপছন্দনীয় কোন কথা বা কাজের ব্যাপারে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে নির্ধারিত ব্যক্তি বিশেষকে ইঙ্গিত করাকে তা'রীয বা পরোক্ষ ইঙ্গিত বলে। এ বর্ণনারীতিতে বক্তব্যের মাঝখানে ঐ ব্যক্তির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয় যা বক্তা এবং তিনি যাকে বুঝাতে চান সে-ই বুঝতে পারে। অন্যান্য শ্রোতা তখন চিন্তায় পড়ে যান যে, কাকে বলা হচ্ছে। তখন মূল ব্যাপারটি বুঝানোর দরকার পড়ে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এ বর্ণনারীতি অনুসরণ করেছেন। তিনি কারো কোন মন্দ কাজ দেখলে তার অপছন্দের কথা এভাবে প্রকাশ করতেন–

مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَفْعَلُوْنَ كَذَا وَكَذَا ـ

কি হলো ঐসব লোকদের যারা এমন এমন করে?

কুরআন মাজীদেও এমন রীতি দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا ـ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে মীমাংসা করেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর নিজেদের ব্যাপারে অধিকার থাকা সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করবে, সে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হবে।" (আহযাব-৩৬)

আয়াতটিতে হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ (রা.) ও তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ (রা.)-এর ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِى الْقُرْبٰى

www.pathagar.com

وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ص وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ط اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

"তোমাদের মধ্যে যারা ধনসম্পদ আর প্রাচুর্যের অধিকারী তারা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে দান করবে না বলে যেন শপথ না করে। তারা ওদেরকে যেন ক্ষমা করে এবং দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যায়। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নূর-২২)

এ আয়াতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ ধরনের বক্তব্যে মূল ঘটনা না জানলে উদ্দেশ্য বুঝা যাবে না।

যুক্তিভিত্তিক রূপক

ক্রিয়া (فعل) কে তার মূলকর্তার (فاعل) বদলে অন্য কোন কর্তার (فاعل) সাথে জুড়ে দেয়া। অথবা মূলকর্ম (مفعول به) ছেড়ে অন্য কর্মকে তার কর্ম বলে দেয়া।

এটা করা হয় তখন, যখন ক্রিয়া ও তার বানানো কর্মের ভেতর কোথাও কোন সাদৃশ্য থাকে। অথবা বক্তা যার ব্যাপারে এমন বলে, সেও মূলকর্তা বা কর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয় বা তার সাথে যোগ রাখে। যেমন– সাধারণত বলা হয়–

بَنَى الْاَمِيْرُ قَصْرًا ـ

আমীর প্রাসাদ বানিয়েছে। অথচ আমীর নিজ হাতে প্রাসাদ তৈরী করেননি। তেমনি বলা হয় :

اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ ـ – বসন্ত তরি-তরকারী জন্ম দিয়েছে।

এখানে আমীর নিজ হাতে প্রাসাদ তৈরী করেননি। বরং রূপকার্থে প্রাসাদ তৈরীর কর্মকে আমীরের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তেমনি বসন্তকাল তরি-তরকারী উৎপন্ন করে না। তরি-তরকারী উৎপন্ন করার মূলকর্তা আল্লাহ তা'আলা, বসন্তকালে উৎপন্ন হওয়ার কারণে রূপকার্থে বসন্তকালকে কর্তা বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের রূপকের ব্যবহার কুরআন মাজীদেও অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন মাজীদের শব্দ বিন্যাসের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং মনরঞ্জনকারী আশ্চর্য বর্ণনারীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনের বাক্য বিন্যাস ও সূরাগুলোর বর্ণনারীতি

কুরআন মাজীদ অন্যান্য বইয়ের মত বিষয়বস্তু বিন্যাসে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ আকারে রচিত হয়নি। বরং কুরআনকে একটি ফরমান গ্রন্থ মনে করা যায়। রাজা-বাদশাহগণ যেমন অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রজাদের প্রতি একটি ফরমান পাঠান। আবার কিছু দিন পর আরেকটি ফরমান পাঠান। আবার কিছু দিন পর আরেকটি ফরমান পাঠালেন। এভাবে প্রয়োজন অনুসারে ধারাটি চলতে থাকে। পরে একজন সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশন করেন এবং একটি গ্রন্থের রূপ দান করেন। তেমনিভাবে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলের কাছে বান্দাদের পথ প্রদর্শনের জন্য সময়ের চাহিদা মোতাবেক এক সূরার পর আরেক সূরা অবতীর্ণ করেন।

নবীজির যুগে কুরআনের সূরাগুলো আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষিত ছিল। তারপর হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর যুগে বিশেষ ধারায় এক সাথে সংকলন করা হয়। আর তাকে 'মুসহাফ' নামে নামকরণ করা হয়।

সূরাসমূহের বিন্যাস

সাহাবায়ে কিরামের সময় সূরাগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

১. اَلسَّبْعُ الطُّوَلُ এগুলো কুরআনের দীর্ঘতম সূরা।

২. اَلْمِئُوْنَ الطُّوَلُ যেসব সূরার আয়াত সংখ্যা একশো বা তার চেয়ে সামান্য বেশি।

৩. اَلْمَثَانِىْ – যেসব সূরার আয়াত সংখ্যা একশো'র কম।

৪. اَلْمُفَصَّلُ – এ তিন প্রকারের বাইরের সূরাগুলো।

www.pathagar.com

কুরআন মাজীদ পূর্ণ বিন্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তার সূরার বিন্যাস ধারা এমনই ছিল। পরে সূরাগুলোকে চূড়ান্তভাবে সাজানোর সময় কিছু পরিবর্তন আনা হয়। مِئِيْن সূরাগুলোর সাথে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে مَثَانِى -এর দু-তিনটি সূরাকে রাখা হয়। এভাবে অন্যান্য প্রকারেও কিঞ্চিত রদবদল করা হয়।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলে কুরআন মাজীদ

এভাবে সামান্য রদবদল করে চূড়ান্তভাবে বিন্যস্ত করে হযরত উসমান (রা.) তার কয়েকটি কপি তৈরী করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। যেন সবাই এর অনুসরণ করে এবং অন্যরূপ দিতে চেষ্টা না করে।

শাহী ফরমানের মত সূরাগুলোর শুরু-শেষ

পবিত্র কুরআনের সূরাগুলোর বর্ণনাভঙ্গি ও রাজা-বাদশাহদের ফরমান বা নির্দেশনামার মধ্যে যেহেতু পূর্ণ মিল রয়েছে তাই দেখা যায়, সূরাগুলোর শুরু-শেষে শাহী ফরমানের বর্ণনারীতি অনুসৃত হয়েছে। রাজা-বাদশাহরা যেমন তাদের ফরমান শুনে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করেন, কোনটা আবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে শুরু করেন, কোনটা প্রাপক-প্রেরকের ঠিকানা দিয়ে শুরু করেন, কোন কোন ফরমান আবার শিরোনাম ছাড়াই চিরকুটের আকারে, কোনটি লম্বা, কোনটি সংক্ষিপ্ত। তেমনি আল্লাহ তা'আলা কোন কোন সূরা তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে শুরু করেছেন, কোন সূরা নাযিলের উদ্দেশ্য বলে শুরু করেছেন। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

"এ কিতাবে কোন সন্দেহ নেই। তা মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ।" (বাকারা-২)

অন্যত্র ইরশাদ করেন : سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا ـ

"এটা একটা সূরা, আমি এটি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি।" (সূরা নূর-১)

এ ধরনের সূরাগুলো রাজা-বাদশাদের ঐসব ফরমানের মত যেসব ফরমানের শুরুতে তারা লিখে থাকেন : 'এটি ঐ নির্দেশনামা যার ব্যাপারে অমুক অমুক একমত' এবং 'এটা ঐ নির্দেশনামা যা অমুকের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হুদায়বিয়ার সন্ধিনামায় লিখেছিলেন :

هٰذَا مَا قَضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ ﷺ.

www.pathagar.com

"এটি সেই চুক্তি যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পাদন করেছেন।" (বুখারী-৩৭২)

কোন কোন সূরা শুরু করেছেন প্রেরক-প্রাপকের নাম দিয়ে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ

"এ কিতাব পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" (সূরা জাসিয়া-২)

আরেক সূরাতে ইরশাদ করেন :

كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ـ

"এ কিতাব প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে এর আয়াতগুলো সংক্ষিপ্ত এবং পরে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।" (হূদ-১)

এ ধরনের সূরাগুলো রাজা-বাদশাহদের বিভিন্ন চুক্তিনামা বা নির্দেশনামার মত। যারা শুরুতে লেখা থাকে– 'মাননীয় শাসনকর্তার দরবার থেকে এ নির্দেশ জারি করা হলো' বা 'অমুক শহরবাসীর প্রতি মাননীয় শাসনকর্তার নির্দেশনামা'। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাটের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন। তার শুরুতে লেখা ছিল–

مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ إِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ ـ

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি" কোন কোন সূরা আবার শিরোনাম ছাড়াই চিরকুট লেখার মত শুরু করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা মুনাফিকুন শুরু করেছেন এভাবে :

اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ ـ

"যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে।" (মুনাফিকুন-১)

অন্য এক সূরার শুরু করেন এভাবে :

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا ـ

"নিশ্চয় আল্লাহ ঐ নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে।" (মুজাদালা-১)

সূরা তাহরীমের শুরুতে ইরশাদ করেন : يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ ـ

"হে নবী! তুমি কেন নিষিদ্ধ করেছ?" (তাহরীম-১)

www.pathagar.com

কবিতার মত কিছু সূরার সূচনা

আরবরা তাদের ভাষার অলংকার প্রকাশ করত তাদের লম্বা-লম্বা কবিতায়। এক্ষেত্রে তাদের রীতি ছিল আশ্চর্য স্থানসমূহ এবং ঘটনাবলী উল্লেখ করে ঐসব কবিতা শুরু করত। তাই আল্লাহ তা'আলাও কিছু সূরায় এ রীতি অনুসরণ করেছেন। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ـ

"শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং যারা কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়।" (সফ্ফাত-১-২)

সূরা যারিয়াতের শুরুতে ইরশাদ করেন :

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ـ

"শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার, শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের।" (যারিয়াত-১-২)

সূরা তাকভীরের শুরুতে ইরশাদ করেন :

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ـ

"সূর্যকে যখন গুটিয়ে ফেলা হবে, যখন তারাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে।" (তাকভীর-১-২)

শাহী ফরমানের মত সূরা শেষ করা

রাজা-বাদশাহরা যেমন তাদের ফরমান বা নির্দেশনামা সারগর্ভ, দুর্লভ উপদেশাবলী, উল্লিখিত বিধান মেনে চলার জোর তাকিদ, বিরোধিতাকারীদের প্রতি কঠোর সতর্ককারী উচ্চারণ করে শেষ করেন। ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা তথ্য সমৃদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত আকারে, সারগর্ভ বক্তব্য, নির্দেশ মান্য করার জোর তাকিদ, অমান্যকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে সূরা কতক শেষ করেন। যেমন– সূরা যিলযাল, হামীম আস্-সাজদা, সূরা তাকাসুর এবং সূরা মুনাফিকুন।

সূরার মাঝখানে বাগ্মিতাপূর্ণ কথা

কখনো আবার সূরার মাঝখানে অলংকার সমৃদ্ধ উপকারী কথা উল্লেখ করা হয়। যাতে প্রশংসা ও পবিত্রতার বর্ণনা দেয়া হয় বা বিশেষ কোন দয়া ও অনুগ্রহের উল্লেখ থাকে, যেমন–

www.pathagar.com

এক. আল্লাহ তা'আলা স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মর্যাদার তারতম্যের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ط اٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

"বল, সব প্রশংসা আল্লাহরই এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি শান্তি। আল্লাহ কি শ্রেষ্ঠ না তারা যাদেরকে শরীক করে তারা?" (সূরা নামল-৫৯)

তার পরবর্তী পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো চমৎকার অলংকারিক ভাষায় এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

দুই. সূরা বাকারার মাঝখানে বনী ইসরাঈলদের সাথে বিতর্কের ব্যাপারটি এভাবে শুরু করেন : يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ ..... .

"হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর...।" (সূরা বাকারা-৪৭)

তারপর ১২২ ও ১২৩ নম্বর আয়াত দু'টোর মাধ্যমে এ বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এটা অলংকার শাস্ত্রের আলোকে অত্যন্ত চমৎকার রীতি।

তিন. সূরা আলে ইমরানের মধ্যাংশে আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক শুরু করেছেন এভাবে- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ .

"আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম।" (আলে ইমরান-১৯)

এটাই যেহেতু বিতর্কের মূল বিষয়, তাই প্রথমেই দাবি উত্থাপন করা হয়েছে এবং বিতর্কের পুরো সময়টা জুড়ে মূল দাবিটি মনে জেগে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূরাগুলোতে আয়াতের বিন্যাস ও অনুপম অলংকারশৈলিতা কবিতা, কাসীদা যেমন ছন্দ মিল রেখে বিন্যস্ত করা হয় ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামের অধিকাংশ সূরাকে শেষ শব্দে ছন্দ মিল রেখে আয়াতসমূহ বিন্যস্ত করেছেন।

আয়াত ও পংক্তির মধ্যে পার্থক্য

আয়াতগুলোকে এভাবে বিন্যস্ত করার উদ্দেশ্য হলো, পাঠক-শ্রোতা উভয়ের চিত্তবিনোদন করা, এ হিসেবে কবিতা ও সূরার মধ্যে অভিন্নতা রয়েছে। তবে ছন্দ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত ও কবিতার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

www.pathagar.com

খলিল ইবনে আহমদ যেসব স্বর ও ছন্দ আবিষ্কার করেছেন, আরবী কবিতায় সেসব মেনে চলতে হয়। তারপরে যেসব কবি এসেছেন সবাই তাঁর থেকে এ কাব্য শাস্ত্র শিখেছেন।

কিন্তু কুরআনের আয়াতের ভিত্তি মানুষের স্বভাবজাত স্বর ও ছন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্র বিশারদদের কৃত্রিম ও পারিভাষিক স্বর ও ছন্দ তাতে অনুসৃত হয়নি।

আয়াত ও পংক্তির পারস্পরিক মিল

কুরআনের আয়াত ও কবিতার পংক্তির মধ্যকার সামঞ্জস্যতার ব্যাপারটির বিশ্লেষণ হলো– সাধারণ ভাষায় এটাকে (কবিতা) আমরা গজল বা 'সুরমাখা আবৃত্তি' বলে প্রকাশ করে থাকি। তারপর ঐসব বিষয়গুলো নির্ধারণ করা, যা কুরআনের আয়াতে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং কবিতার পংক্তিতে তা দেখা যায় না। বিষয় দু'টো বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। 'আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দাতা'।

অর্থাৎ– প্রত্যেক সুরুচির অধিকারী ব্যক্তিই ছন্দময় এবং বাক্যের শেষ শব্দের মিল বিশিষ্ট কবিতায় এবং সুন্দর মনোমুগ্ধকর পদ্য ইত্যাদিতে স্বাদ অনুভব করে। কেউ যখন এ স্বাদমাখা অনুভূতির কারণ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে, তখন দেখে যে, শ্রোতামন ছন্দময় বাক্যে এক বিশেষ ধরনের স্বাদ আস্বাদন করে এবং এ ধরনের আরো বাক্য শোনার অপেক্ষায় থাকে। অপেক্ষার পর যখন তেমনি ছন্দময় আরেকটি পংক্তি শুনতে পায় এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি অর্জন করে, তখন স্বাদ আরো বেশি পরিমাণে অনুভূত হয়।

যখন দু'টো ছন্দময় পংক্তির শেষ শব্দে একই ধরনের স্বরযুক্ত মিল হয়, তখন স্বাদ আরো বেড়ে যায়। মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

মোটকথা কবিতার পংক্তিমালা থেকে স্বাদ আস্বাদন করা এটা মানবেতিহাসে জন্মগত আদি স্বভাব। আসলে সব দেশের সব জাতির সুস্থ মেজাযসম্পন্ন লোক মাত্রই এ ব্যাপারে একমত। ছন্দের প্রতি সার্বজনীন এ ঐক্যমত্য থাকা সত্ত্বেও সব এলাকায় এর রীতিনীতি এবং ধারণা এক নয়। তেমনি ছন্দ ও স্বর রীতির শর্তাবলীতেও মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন– আরবী কবিতা রীতি। তাদের স্বতন্ত্র একটি মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন রয়েছে যা আরবী ভাষাবিদ খলিল ইবনে আহমদ প্রবর্তন করেছেন। ভারতবাসীরা আবার আলাদা আরেক নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে। ভাষাগত যোগ্যতা এবং জন্মগত মেধার মাধ্যমে তারা একটা মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন। এমনিভাবে যুগে-যুগে লোকেরা এর ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-নীতি আবিষ্কার করেন এবং নতুন-নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

www.pathagar.com

ছন্দময় বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে মোটামুটি সামঞ্জস্যকেই পারস্পরিক মিল বলার জন্য যথেষ্ট

আমরা যদি চাই, ছন্দ সম্পর্কিত বিভিন্ন রীতিনীতি ও মতবিরোধ খতিয়ে দেখব যে, তাতে পরস্পর মিলের বিষয়গুলো কী? এবং যদি চিন্তা করি যে, তাতে কি কি রহস্যাবলী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে? তখন সেখানে যে বিষয়টি খুঁজে পাব, তা হলো, মোটামুটি সামঞ্জস্য। এ ছাড়া আর কিছু নয়। বিভিন্ন কবিতা-পংক্তিগুলো পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, এমনটি নয়। আরব কবিগণ নিজেদের মূলনীতি থেকে সরে এসে কবিতা রচনা করেছেন। তারা কবিতায় স্বর মিলের ধারা হিসেবে مُسْتَفْعِلُنْ-এর স্থলে مُفَاعِلُنْ ও مُفْتَعِلُنْ ব্যবহার করেছেন। فَاعِلاَتُنْ-এর পরিবর্তে فَعِلاَتٌ ও فَاعِلْتُنْ ব্যবহার করাকে মূলনীতির পক্ষেই পরিগণিত করেন। এক পংক্তির দ্বিতীয় চরণের শেষাংশের সাথে অপর পংক্তির দ্বিতীয় চরণের শেষাংশের মিল হওয়া এবং এক পংক্তির প্রথম চরণের শেষাংশের সাথে অপর পংক্তির প্রথম চরণের শেষাংশের মিলন হওয়াকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন।

আরব কবিগণ কবিতার চরণের মধ্যখানে অনেক 'যিহাফ'[১] কে বৈধ মনে করেন। কিন্তু ইরানী কবিদের কাছে 'যিহাফ' একটি অপছন্দনীয় কাজ।

আরব কবিদের মতে, একই কবিতায় এক পংক্তির 'রিদফ' (رِدْف) ওয়াও (و) আর অন্য পংক্তির রিদফ ইয়া (ى) হওয়া বৈধ। যেমন এক পংক্তি শেষ হয়েছে قُبُوْرًا শব্দের মাধ্যমে আর অন্য পংক্তি শেষ হয়েছে مُنِيْرًا শব্দের মাধ্যমে। কিন্তু ইরানী কবিদের কাছে এ ধরনের আচরণ অবৈধ। তাদের মতে কবিতায় এ ধরনের ভিন্নতা একটা ত্রুটি।

আরব কবিদের মতে, যে কবিতা শেষ শব্দ حَاصِلْ، دَاخِلْ، نَازِلْ ইত্যাদির মত হবে, ঐ কবিতায় سُنْبُلْ، مَنْزِلْ، بُلْبُلْ শব্দের অন্তমিল থাকা দূষণীয়। কিন্তু ইরানী কবিদের মতে উভয়টি একই মাত্রার কোনটি দূষণীয় নয়। আরব কবিদের মতে একটি শব্দের অর্ধেক প্রথম চরণে বাকী অর্ধেক দ্বিতীয় চরণে উল্লেখ করা বৈধ। কিন্তু ইরানী কবিদের মতে তা অবৈধ।

মোটকথা, এসব উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মোটামুটি সামঞ্জস্যতা আরবী ও ইরানী ছন্দময় বাক্যের মধ্যে একক ঐক্যসূত্র। পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যতার

১. শব্দে দ্বিতীয় অক্ষরের পরিবর্তনকে যিহাফ (زحاف) বলে যেমন- فَا এবং فَعْ.

www.pathagar.com

ব্যাপারে সবাই এক মত নয়। তাছাড়া আত্মিক প্রশান্তি লাভের জন্য এমন মোটামুটি সামঞ্জস্যতাই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে সুনির্ধারিত মূলনীতি মানা জরুরি নয়।

ভারতবর্ষের কবিরা তাদের কবিতার মাত্রা নির্ধারণ করেছেন অক্ষর সংখ্যার ভিত্তিতে। যের-যবর-পেশ ও সাকিনের প্রতি খেয়ালই দেয়া হয়নি। এতেই তারা কাব্য স্বাদ লাভ করেন। অথচ আরবী ও ইরানী কবিরা যের-যবর-পেশ ও সাকিনের ভিত্তিতে তাদের কবিতা রচনা করেন।

আমি গ্রামের অনেক মূর্খ লোককে গান গাইতে দেখেছি তারা এসব গেয়ে আনন্দ অনুভব করে, তারা তাতে এমন ছন্দ ব্যবহার করে যা মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি তাদেরকে শেষ অক্ষরে মদের হরফ ব্যবহার করতে দেখেছি (رَدِيْف)। তারাও রদীফে' সমতা বজায় রাখাকে জরুরী মনে করে না। তাদের 'রদীফ' কখনো হয় এক শব্দের, আবার কখনো একাধিক শব্দের। আরবরা যেমন কাসীদা পাঠ করে আনন্দ লাভ করে তেমনি গ্রামের এসব লোকেরাও গীত গেয়ে আনন্দ অনুভব করে।

আসলে ছন্দময় বাক্য তৈরীতে জাতি ভেদে স্বতন্ত্র নিয়ম-কানুন রয়েছে।

এসব আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, কবিতা তৈরীর নীতিমালার ব্যাপারে বিভিন্ন অংশ মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। সামনের আলোচনাতে আমরা দেখব শুধু কবিতাই নয়, গান ও সুরের মূলনীতির ব্যাপারেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু এ অনৈক্য সত্ত্বেও সুরময় আওয়াজ ও সুমধুর কণ্ঠের মাধ্যমে আনন্দ পাবার ক্ষেত্রে আবার ঐক্য রয়েছে।

দেখুন, গ্রীক গায়ক ও সুরকারগণ স্বর ও সুর তৈরীর জন্য বারটি 'ওজন' বা মাত্রা নির্ধারণ করেছেন। তারা একে 'মাকামাত' বলে থাকেন। এসব মাকামাত থেকে আরো অনেক স্বর ও শাখা উদ্ভাবন করেছেন। এভাবে তারা নিজস্ব একটি শাস্ত্র সংকলন করে নিয়েছেন।

ভারতবর্ষের সুরকারগণ প্রথমত ছয়টি রাগ নির্ধারণ করেছেন। তারপর আবার প্রত্যেকটি রাগ থেকে অনেকগুলো শাখা বের করেছেন।

আমি ভারতীয় গ্রাম্য লোকদেরকে দেখেছি, তারা নিজেদের সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের গান তৈরী করে এবং সেসব গেয়ে তারা মজা অনুভব করে। এর জন্য তারা নিয়মতান্ত্রিক কোন মূলনীতি নির্ধারণ করেনি। না কোন বিধি-উপবিধি সন্নিবেশন করেছে।

কাব্যরীতির এসব বিশ্লেষণ উল্লেখ করার পর আমরা যদি মানুষের স্বতলব্ধ

www.pathagar.com

জ্ঞানকে বিচারক বানাই, তাহলে কাছাকাছি সামঞ্জস্য ছাড়া আমরা আর কিছুই পাই না। মানুষের সাধারণ জ্ঞান এ সিদ্ধান্তই প্রকাশ করে যে, বিভিন্ন ছন্দময় বাক্যের মধ্যে প্রকৃত ও পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য নেই। আনুমানিক সামঞ্জস্যই বিভিন্ন ছন্দময় বাক্যের মধ্যে যৌথ ঐক্যসূত্র। আর মানুষের অনুভূতি এ সামগ্রিক মিলকেই বিবেচনা করে। আর এ সাদৃশ্যপূর্ণ সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হয়। (المردفة। الموصولة)[১] 'রিদফ' ও 'ওসূল' বিশিষ্ট শেষবর্ণের মিলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি মনের বিশেষ কোন আগ্রহ নেই। সুস্থ মন এবং সুস্থ রুচি শুধু ভেজালমুক্ত স্বাদ ও মিষ্টতাকেই ভালবাসে। ছন্দশাস্ত্রের কৃত্রিম মূলনীতির সাথে সুস্থ রুচির কোন সম্পর্ক নেই।

আল কুরআনের বর্ণনারীতিতে চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্বারোপ

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা যখন এক মুষ্টি মাটি থেকে সৃজিত মানব-জাতিকে সম্বোধন করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন (তাদের উদ্দেশ্যে যে বাক্য ব্যবহার করেন) সব কবিতা ও সঙ্গীতের ঐক্যসুর চিরন্তন সৌন্দর্য ও সবার কাছে শোভনীয় রীতিটি বেছে নেন। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন রীতি-প্রথা বর্জন করেন। যা সব সময় পরিবর্তনশীল।

আসলে মানুষ যুগে-যুগে তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা যেমন রীতি-নীতি প্রণয়ন করেছে, তা ক্রমাগতই তাদের মূর্খতার পরিচয় দিতে থাকে। এ জন্য এটা ছেড়ে দিয়ে বাক্য বা গানের সঠিক সৌন্দর্য ও শৈল্পিক শোভাসমূহকে এমনভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয় যেন বর্ণনার প্রতিটির ক্ষেত্রেই যথোপযুক্ত ও সুষমমণ্ডিত হয়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে এটাই অলৌকিক ও বিস্ময়কর বর্ণনারীতি। আল্লাহ তা'আলার এ রীতি অবলম্বন করা থেকে আমি একটি মূলনীতি উদ্ভাবন করেছি। আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলা অধিকাংশ সূরাতে মানুষের শ্বাসের দৈর্ঘ্যতার বিষয়টি লক্ষ্য রেখেছেন। 'বাহ্‌রে তাবীল' (بحر طويل) ও বাহরে মাদীদ (بحر مديد)-এর মত প্রচলিত মাত্রাকে লক্ষ্য রাখেননি। তেমনি ছন্দের ক্ষেত্রেও ঐ পথ অনুসরণ করা হয়নি, যা আমরা কবিতায় দেখতে পাই। বরং একটি শ্বাস নিয়ে যে শব্দটি শেষ হয়, সেই শব্দটি আয়াতে ছন্দের গ্রন্থি হয়ে দেখা দেয়। এখানেও ছন্দশাস্ত্রের মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। এ কথাটি আসলে ব্যাখ্যা-

---

১. কবিতায় শেষ বর্ণকে কাব্যরীতির পরিভাষায় رَوِىّ বলে। তার পূর্বের মদের হরফকে رِدْف বলে। হা-আলিফ (ها) এবং মদের হরফ– الف। واو، ও ى এ চারটি বর্ণ ওস্‌ল (وصل) -এর বর্ণসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

বিশ্লেষণের দাবি রাখে। পাঠকের কাছে আবেদন হলো, নীচের আলোচনাটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন!

শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যতায় আয়াতের ছন্দরীতি

আসলে কণ্ঠনালীতে শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা-যাওয়া মানুষের স্বভাবজাত একটি ব্যাপার। যদিও শ্বাস দীর্ঘায়িত করা এবং কমিয়ে আনা তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

তারপরও শ্বাসকে যদি স্বাভাবিক গতিতে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তার আসা-যাওয়াটা একটা নির্ধারিত সময় অনুসরণ করে। মানুষ যখন একবার শ্বাস নেয় তখন তার ভেতর একটা প্রশ্বাস প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেটা আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত একদম থেমে যায়। ফলে সে দ্বিতীয়বার নতুন শ্বাস নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের এই আসা-যাওয়াতে একটা সময় পেরিয়ে যায় যদিও সময় অনির্ধারিত। একটু কমবেশি হয়ে থাকে। তারপরও এ কমবেশিটা একটা সীমার ভেতরেই থাকে।

সুতরাং বাক্য বা চরণের ভিত্তি যদি এ শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর রাখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, চরণের মধ্যে দু-তিন শব্দের চেয়ে বেশি কমবেশ নেই। বরং প্রকৃত ব্যাপারগুলো, কোন শব্দের চার ভাগের এক ভাগ বা তিন ভাগের এক ভাগ কমবেশি হওয়া অল্পই দেখা দেয়। এ তুচ্ছ পার্থক্য তেমন গুরুতর কিছু নয়। যদ্বরুন বলা যেতে পারে যে, চরণটি নিয়মের সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। এর ফলে তেমন কোন ক্ষতি হয় না। বরং রচনার ক্ষেত্রে বাড়ানো-কমানোর সুযোগ পাওয়া যায়।

সুতরাং নিয়ম-নীতির ভেতরে থেকেও বাক্যের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখা যায়। এমনকি বাড়ানোরও অবকাশ থাকে।

মোটকথা শ্বাসের এই স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যতাকেই কুরআন মাজীদের আয়াতের ছন্দরীতি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ ছন্দরীতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. দীর্ঘ ২. মধ্যম ও ৩. খাট

দীর্ঘ আয়াতের উদাহরণ হলো– সূরা নিসার আয়াতসমূহ। মধ্যম আয়াতের উদাহরণ হলো– সূরা আ'রাফ ও সূরা আন'আমের আয়াতগুলো এবং খাট বা ছোট-ছোট আয়াতের উদাহরণ হলো– সূরা শু'আরা ও সূরা দুখানের আয়াতসমূহ।

মদের হরফে শ্বাস শেষ হওয়াই আয়াতের শেষাংশের মিল

আসলে অন্য একটি হরফের উপর নির্ভরশীল মদের হরফে শ্বাস শেষ হওয়াই কুরআনের ব্যাপক ছন্দরীতি। যা বারবার দোহরানোর দ্বারা মানুষ প্রকৃতি তৃপ্তি লাভ করে।

www.pathagar.com

যদিও এ মদটি কোথাও 'আলিফ', (কোথাও 'ওয়াও' বা 'ইয়া') হয়। তেমনি যে হরফের উপর মদের হরফটি নির্ভরশীল যদিও সে হরফটি কোন আয়াতে 'বা' কোন আয়াতে 'মীম' বা ক্বফ হয়। সুতরাং مُسْتَقِيْمٌ ـ مُؤْمِنِيْنَ ـ يَعْلَمُوْنَ সবই সামঞ্জস্যশীল।

তেমনি আবার مَرِيْج، خُرُوْج، عُجَاب، فُوَاق ـ تَبَار এবং تَحِيْد ইত্যাদিও নিয়ম মাফিক। কারণ সব শব্দগুলোতে শ্বাস শেষ হয়েছে, অন্য একটি হরফের উপর নির্ভরশীল মদের হরফে।

শব্দের শেষে আলিফ যুক্ত হওয়াও একটি ছন্দ মিল

শব্দের শেষে আলিফ যুক্ত হওয়াও কুরআন মাজীদের ব্যাপক একটি ছন্দ মিল। এ ধরনের বিশিষ্ট আয়াত বারবার দোহরানোর মাধ্যমেও মানুষ তৃপ্তি অনুভব করে যদিও শেষ অক্ষরটি ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন, এক আয়াতের শেষ শব্দ হলো– كَرِيْمًا। অন্য আয়াতে শেষ শব্দ حَدِيْثًا। অন্য আয়াতে শেষ শব্দ– بَصِيْرًا। এখানে যদি শেষ অক্ষরটি এক হতে হবে বলে জরুরি করে দেয়া হয় তাহলে তো যা আবশ্যক নয় তাকে আবশ্যক বলে ঘোষণা দেয়ার শামিল হবে। তারপরও কোথাও কোথাও শেষ অক্ষরটি একই হতে দেখা যায়। যেমন, সূরা মারইয়ামের প্রাথমিক আয়াতগুলোতে আলিফের আগে 'ইয়া' দেখা যায়। তাছাড়া সূরা ফুরকানের প্রাথমিক আয়াতগুলোতে আলিফের আগে 'রা' এবং 'লাম' দেখা যায়।

একই হরফ এবং একই বাক্য বারবার উল্লেখ করা

সব আয়াতের শেষে একই হরফযুক্ত করাও একটি তৃপ্তিদায়ক ছন্দরীতি। যেমন, সূরা মুহাম্মদের শেষ শব্দের শেষে মীম যুক্ত হয়েছে। সূরা আর-রহমানে সব আয়াতের শেষে 'নূন' যুক্ত হয়েছে। এতেও আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়।

তেমনি কয়েকটি বাক্যের পরপর একটি বাক্য বারবার উল্লেখ করাও তৃপ্তিদায়ক ব্যাপার। সূরা শু'আরা, সূরা ক্বমার, সূরা আর-রহমান ও সূরা মুরসালাতে এমন পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো আর শেষ আয়াতগুলোর পার্থক্য

কখনো সূরার প্রথম দিকের আয়াতসমূহ শেষ দিকের আয়াতসমূহ থেকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়। শ্রোতাকে আনন্দ দেয়ার জন্য এবং বাক্যের সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য। যেমন, সূরা মারইয়ামের শেষ দিকের বিরতিগুলো হলো– وُدًّا ـ هَدًّا ـ اِدًّا।

আর প্রথম দিকের বিরতিগুলো– وَلِيًّا ـ خَفِيًّا ـ زَكَرِيَّا ـ

www.pathagar.com

সূরা ফুরকানের শেষ দিকের বিরতিগুলো হলো- ـ اِمَامًا ـ كِرَامًا ـ سَلَامًا

কিন্তু প্রথম দিকের বিরতিগুলো- ـ نُشُوْرًا ـ تَقْدِيْرًا ـ نَذِيْرًا

সূরা সোয়াদের শেষ দিকের বিরতিগুলো হলো- ـ مُنْظَرِيْنَ ـ سَاجِدِيْنَ ـ طِيْنَ

কিন্তু প্রথম দিকের বিরতিগুলো- ـ كَذَّاب ـ مَنَاص ـ شِقَاق-এর মত।

মোটকথা, আগে যে, ছন্দ মিলের কথা বলা হয়েছে, অধিকাংশ সূরায় সেই ছন্দ মিলের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বিরতির জায়গায় আল কুরআনের রীতি

আয়াতের শেষ শব্দটি যদি ছন্দময় হয়, তাহলে তো ভাল। নতুবা তার সাথে এমন একটি বাক্য সংযুক্ত করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি বা অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে বা শ্রোতাকে সাবধান করে কোন বক্তব্য জুড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ـ

"আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।" (সূরা আনআম-১৮-৭৩/সূরা সাবা-১)

আবার কোথাও বলেছেন- ـ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসা-১৭-৯২-১০৪-১১১-১৭০; সূরা ফাতাহ-৪)

আবার কোথাও বলেছেন- ـ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যাপারে অবগত।" (সূরা ফাতাহ-১১)

আবার কোথাও বলেছেন- ـ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"যেন তোমরা সাবধান হও।" (সূরা বাকারা-২১-৬৩-১৭৯-১৮৩; সূরা আন'আম-১৫৩; সূরা আ'রাফ-১৭১)

কোথাও আবার ইরশাদ করেছেন- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ.

"তাতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে উপদেশ।" (সূরা যুমার-২১)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

www.pathagar.com

"তাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা রা'দ-৩; সূরা রূম-২১; সূরা যুমার-৪২; সূরা জাছিয়া-১৩)

এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কখনো আবার বক্তব্য দীর্ঘায়িত (اطناب) করেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ـ

"সুতরাং এ সম্পর্কে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।" (ফুরকান-৫৯)

কখনো আবার ছন্দ মিল করার জন্য শব্দ আগ-পিছ করেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

"নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি দয়ালু, করুণাময়।" (বাকারা-১৪৩)

এখানে অলংকার শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী رحيم আগে এবং رؤوف পরে আসা উচিত ছিল। কিন্তু ছন্দ মিলের কারণে তার বিপরীত করা হয়েছে।

আবার কখনো অক্ষর পরিবর্তন ও বৃদ্ধি করেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা اِلْيَاسْ-এর স্থলে ইরশাদ করেছেন- اِلْ يَاسِيْنَ (সূরা-সফফাত-১৩০) এবং سِيْنَا শব্দের স্থলে ইরশাদ করেছেন- وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ (সূরা তীন-২)

ছোট আয়াতের সাথে লম্বা আয়াত এবং লম্বা আয়াতের সাথে ছোট আয়াত

কুরআন মাজীদে মাত্রাবিহীন কিছু আয়াত আছে। কোন আয়াত খাট আর তার সাথেই থাকে লম্বা আয়াত। আসলে কিন্তু তাও মাত্রা ছাড়া নয়। কারণ এ ধরনের জায়গায় কাব্যরীতির বিশেষধারা অনুসরণ করা হয়েছে অথবা কোন প্রবাদ বাক্য সন্নিবেশন করা হয়েছে বা একই বাক্যাংশ বারবার উল্লিখিত হয়েছে। তাই ছোট আয়াত ও বড় আয়াতের একই ছন্দ মাত্রার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

কোথাও গুরুর বাক্যাংশ শেষের বাক্যাংশের চেয়ে ছোট করা হয়েছে। ফলে বাক্যের সৌন্দর্য ও মাধুর্য আরো বেড়ে গেছে। যেমন-

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ـ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ـ

www.pathagar.com

এ ধরনের যেসব আয়াত শুরুর দু'অংশ ছোট এবং তৃতীয় বা শেষ অংশকে সমমাত্রার করে নেয়া হয়।

তিন যতি বিশিষ্ট আয়াত

যতি অর্থাৎ বিরাম স্থান। কুরআন মাজীদের কখনো কখনো তিন যতি বিশিষ্ট আয়াত রচিত হয়েছে অর্থাৎ তিনটি যতি মিলে এক আয়াত এবং এক চরণ আর পরবর্তী আয়াত আরেক চরণ। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ـ وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ـ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

"সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু চেহারা কাল হবে, যাদের চেহারা কাল হবে, তাদেরকে বলা হবে, ঈমান আনার পর কি তোমরা কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর। যেহেতু তোমরা কুফরী করতে। আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর অনুগ্রহে থাকবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" (সূরা আলে ইমরান-১০৬-১০৭)

এখানে দু'টো আয়াত রয়েছে। প্রথম আয়াতটি দ্বিতীয় আয়াতের তুলনায় বড়। তাই এতে ছন্দ মিল না থাকায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। আসলে এখানে তিনটি যতি বা থামার জায়গা রয়েছে। একটি تَسْوَدُّ وُجُوهٌ এর وُجُوهٌ শব্দে, দ্বিতীয় যদি تَكْفُرُوْنَ শব্দে আর তৃতীয় যতি خَالِدُوْنَ শব্দে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যতি না বুঝে ধারাবাহিক লম্বা কয়েকটি আয়াত মনে করে থাকে। সুতরাং ছন্দ মিলের ব্যাপারটি তারা বুঝতে পারে না।

দুই যতি বিশিষ্ট আয়াত

কখনো আল্লাহ তা'আলা আয়াতে দু'টো যতি নিয়ে আসেন। (যেমন সূরা আর রহমান-১৭, ওয়াকিয়া ৮/৪১ আয়াত দেখা যেতে পারে।)

কবিতায় সাধারণত যেমনটি দেখা যায়। যেমন–

كَالزَّهْرِ فِيْ تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِيْ شَرَفٍ + وَالْبَحْرِ فِيْ كَرَمٍ وَالدَّهْرِ فِيْ هِمَمٍ ـ

www.pathagar.com

(তিনি) "কোমলতায় যেন ফুল, মর্যাদায় চন্দ্রতুল্য, উদারতায় মহাসাগর আকাঙ্ক্ষায় তিনি কাল-অমর।"

ছোট খাট আয়াতের সাথে লম্বাতম আয়াত

কখনো পাশাপাশি দু'টো আয়াতের একটি লম্বা হয় অপরটি হয় খাট। তারপরও উভয়ের মধ্যে স্বর ও ছন্দ মিল ঠিকই থাকে। এর রহস্য আসলে আয়াত দু'টোর বর্ণনারীতিতেই লুকানো থাকে, মূল রহস্য হলো, যখন স্বর ও ছন্দসহ কোন চমৎকার বাক্য তৈরী হয়ে এক পাল্লায় আসে আর অন্য পাল্লায় সহজ সাবলীল আকর্ষণীয় একটি বাক্য বসে, উত্তম রুচিবোধ তখন তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যটিকেই গুরুত্ব দেয় বেশি। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে সুযোগ থাকে যে, একটা ছন্দ উপেক্ষা করে অন্য ছন্দে গিয়ে স্বর শেষ করবে। সুরুচির অধিকারী কেউ তখন এ দু'য়ের মধ্যে আর কোন অমিল খুঁজে পাবে না।

স্বর ও ছন্দবিহীন কিছু সূরা

আলোচ্য বিষয়ের শুরুতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা অধিকাংশ সূরাতে স্বর ও ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। সেখানে অধিকাংশ বলার অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা কোন কোন সূরাতে স্বর ও ছন্দের ব্যাপারটি লক্ষ্য করেননি। কুরআন মাজীদের একটি অংশ আরব বক্তাদের বক্তৃতা এবং জ্ঞানী মানুষদের প্রবাদ প্রবচনের পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত মহিলাদের রাত্রিকালিন আলাপ সংক্রান্ত হাদীসটি মনে হয় আপনিও শুনেছেন। (বুখারী-২/৭৭৯), মুসলিম- ২/২৮৭) এবং বর্ণনার ছন্দ মিলগুলো বুঝতে পেরেছেন।

কোন কোন সূরা আরবদের চিঠিপত্রের ভঙ্গিতে কথামালাকে সাজানো হয়েছে। কিন্তু মানুষের কথাবার্তার মতো বিশেষ কিছুর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। তবে আল্লাহ তা'আলা এমন বাক্য ব্যবহার করে কথা শেষ করেছেন, যা আসলেই কথা শেষ হয়েছে বলে প্রকাশ করে অর্থাৎ সাধারণত একই মানের ছন্দ মিল ব্যবহার করে শেষ করেছেন।

আয়াতের শেষাংশে একই মানের ছন্দ মিল লক্ষ্য রাখার কারণ হলো, আরবরা ওখানেই থামেন যেখানে তাদের শ্বাস থেমে যায়। আর বাক্যের সতেজতা ফিকে হয়ে যায়। আর মদের হরফে শ্বাস শেষ হওয়াই উত্তম পদ্ধতি। এজন্যই আল্লাহর কালাম আয়াতের আকার ধারণ করেছে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এ দীনের সামনে যা কিছু উন্মোচন করেছেন তা পেশ করে দিলাম। (আল্লাহ তা'আলাই মহাজ্ঞানী)

www.pathagar.com

নতুন স্বর ও ছন্দরীতি অবলম্বনের কারণ

এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরব কবিদের কাছে স্বীকৃত স্বর ও ছন্দ কেন গ্রহণ করেননি? অথচ এটা তো অধিক মনোরঞ্জনকারী। আমরা বলব, এটা ঠিক যে, তা মনোরঞ্জনকারী কিন্তু সে রীতিনীতি তো একেক জাতি, একেক মনের কাছে একেক রকম। কারো কাছে একটা পছন্দনীয় হয় আবার কারো কাছে তা অপছন্দনীয় হয়।

আর যদি আমরা এটা মেনেও নিই যে, আরবদের স্বর ও ছন্দ বেশি মনোরঞ্জনকারী, তারপরও দু'টো কারণে নতুন রীতি অধিক উপকারী।

১. উম্মী হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নতুন রীতিনীতির উদ্ভাবন তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

২. কুরআন যদি আরব কবিদের কবিতায় ছন্দ ও স্বর অনুসরণ করে অবতীর্ণ হতো তাহলে কাফিররা ভাবত যে, এটা আরব কবিদেরই কবিতাবিশেষ এবং নতুন বৈশিষ্ট্যের অভাবে কুরআন মাজীদ তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারত না। ফলে কুরআনের মাধ্যমে তারা উপকৃত হতো না। আসলে নতুন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বর্ণনারীতির শ্রেষ্ঠত্ব মানুষ মাত্রই সহজে বুঝতে পারে। পুরাতন রীতিনীতির অতুলনীয়তা সবাই মানে না। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবানই বুঝতে পারেন। এজন্যেই আমরা দেখি, অলংকার শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ কবি সাহিত্যিকরা যখন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চান তখন নিজেদের রচনাতে নতুন ধারা সৃষ্টি করে চমক সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন আর চ্যালেঞ্জ করে বলেন– কেউ কি আমার মত এমন রচনা করতে পারবেন? এতে সবাই অনায়াসে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন। তারা যদি পুরাতন রীতিনীতিই অনুসরণ করে রচনা তৈরী করেন, তখন শুধু উঁচুমানের গবেষক ছাড়া আর কেউই তাদের দক্ষতা মেনে নেবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চইল্‌ম বারবার এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে বর্ণনা করার কারণ

১. কুরআনের নতুন পদ্ধতিতে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, তাতে একই অর্থের আয়াত বারবার বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বিশেষ কোন ব্যাপারেই নয়, প্রায় সব ব্যাপারেই এটা ঘটেছে। অধিকাংশ লোকের মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এমনটি কেন করা হলো? একটা বিষয় এক জায়গাতে বলেই শেষ করা হলো না কেন?

www.pathagar.com

আসলে এতে বড় রকমের কৌশল এবং কল্যাণকর উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। যেমন, আমরা যদি কাউকে কিছু শেখাতে যাই বা বুঝাতে যাই, তাহলে তার জন্য দু'টি পথই অবলম্বন করা যেতে পারে। একটি পথ হলো, আমার বলার উদ্দেশ্য যদি শ্রোতাকে শুধু একটি নতুন খবর শুনিয়ে দেয়াই হয় তাহলে একবার বলেই শেষ করব। আর যদি আমার উদ্দেশ্য হয়, বিষয়টি শ্রোতার মনে এমনভাবে গেঁথে দেব যেন সে তার সারকথা এবং সৌন্দর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয় এবং তার চিন্তাধারা ঐ ধাচেই গড়ে ওঠে। তার কাজকর্মসমূহ সে আলোকেই সম্পাদিত হয়, তাহলে বারবার বুঝিয়ে বলা ছাড়া কোন পথ নেই।

একটা উত্তম কবিতার কথাই ধরুন! আমরা কবিতাটি একবার শুনলে তার অর্থ বুঝতে পারি তার স্বাদ গ্রহণ করি। তারপরও বারবার শুনে স্বাদ অনুভব করতে চাই। সুতরাং বুঝা যায়, বারবার বলাতে আনন্দ লাভ করা যায়। মন-মগজে প্রভাব বিস্তার করে। কুরআন মাজীদেও বারবার উল্লেখ করার মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা চালানো হয়েছে।

আসলে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষ্য দু'টি। কিছু ব্যাপার এমন আছে যা শুধু জানিয়ে দেয়াটাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আবার কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো মন-মগজে গেঁথে দেয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথম বিষয়গুলো একবার বলেই শেষ করা হয়েছে। কিন্তু শেষ বিষয়টি বারবার উচ্চারণ করা হয়েছে। যেসব বিধি-বিধান একবার উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো শুধু জাগিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য। মন-মগজে এঁকে দেয়া উদ্দেশ্য নয় অবশ্য এটা অন্য কথা যে, শরীয়ত সেগুলো একবার পাঠ করে নেয়াকে যথেষ্ট মনে করে না বারবার পাঠ করার নির্দেশ দেয়।

কুরআন মাজীদে একই বিষয় বারবার উল্লিখিত হলেও একই বাক্য যাতে বারবার না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রতিবারই নতুন বাক্য নতুন পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে আকর্ষণ তৈরী হয়। মানুষের মন তাতে যেন এক ঘেঁয়েমি অনুভব না করে। একই বাক্য বারবার উল্লেখ করলে স্বাভাবিকত কোন আকর্ষণ অনুভব করত না। কিন্তু বাক্যের বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তিত হওয়ায় প্রত্যেকবারই নতুন আকর্ষণ লাভ করে। মন সেদিকে ধাবিত হয় ফলে তা মনে বসে যায়।

২. এখানে আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে, একই সূরার ভেতর সব বিষয়গুলোকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে কেন? ধারাবাহিক আঙ্গিকে কেন বর্ণনা করা হলো না? অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও নিদর্শনাবলী বর্ণনা হতে পারত, তারপর ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হতো, তারপর কাফিরদের

www.pathagar.com

সাথে যুক্তি-তর্ক করা হতো, এভাবে একের পর এক সাজিয়ে গুছিয়ে বর্ণনা করা হতো। এ প্রশ্ন যথার্থই। আর এটাও ঠিক যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা কঠিন ছিল না। তিনি ইচ্ছা করলে সবই সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারতেন। তবে এ কথাও সত্য যে, আল্লাহ তা'আলার সবকিছুর ভেতর কোন না কোন কৌশল ও উদ্দেশ্য থাকে। আর এটা তাঁরাই বুঝতে সক্ষম, যাঁদের কাছে আল্লাহর ফেরেস্তাগণ আসেন এবং যাদের কাছে এ বাণী পাঠানো হয়।

কুরআন মাজীদ যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরবিদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। তাই তাদের ভাষা ও বর্ণনারীতি সামনে রেখেই তা রচিত হয়েছে। যেন তাদের প্রকৃতি বা মন ও মননের সাথে পুরোপুরি খাপ খায়। কুরআনের আয়াত–

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا : لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ط ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ؟

"আমি যদি এটাকে অনারবী (বর্ণনারীতি বিশিষ্ট) কুরআন বানাতাম, তাহলে তারা অবশ্যই বলত, এ আয়াতগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা হলো না কেন? কি আশ্চর্য! তার বর্ণনারীতি অনারবী, অথচ রাসূল আরবী।" (হামীম আস্-সাজদা-৪৪)

আর আরবদের কাছে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে আসমানী বা মানব রচিত কোন গ্রন্থ ছিল না। আজ আরব সাহিত্যিকরা যে ধারা বা রীতির উপর জোর দিচ্ছে তখনকার যুগের আরবদের কাছে তা ছিল অজ্ঞাত। যে কবিরা প্রাক ইসলামী যুগ ও ইসলামী যুগ পেয়েছেন, তাদের লেখা বা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠিপত্র যদি ভাল করে দেখা যায় তাহলে এ সত্য এমনিতেই ফুটে উঠবে।

সুতরাং কুরআনের ঘটনাবলী সাজানোর ব্যাপারে যদি সে যুগের লোকদের অজানা কোন পন্থা অবলম্বন করা হতো, তাতে তারা হতভম্ব হয়ে যেত। ফলে সহজ-সরল কথা বুঝতে তাদের সমস্যা হতো। অথচ কুরআন তাদের শুধু কিছু জানিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হবার ছিল না, বরং কুরআন চেয়েছে, তার বাণী তাদের মন-মগজে বসিয়ে দেবে। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে সাজানো-গুছানো কথামালার চাইতে তাদের কাছে চির পরিচিত রীতিতে আকস্মিক কথার মাধ্যমেই সফলতা সম্ভব ছিল। নাটকীয় বর্ণনাই শ্রোতার মনকে বেশি আকর্ষণ করে বলেই কুরআন সে পথই বেছে নিয়েছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল কুরআন মু'জিযা হওয়ার দিকসমূহ

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কুরআনে কারীম মু'জিযা হলো কি করে? জবাবে বলব, কুরআনে কারীম মু'জিযা হওয়ার অনেকগুলো দিক রয়েছে।

১. একটি হলো কুরআনের অন্যান্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রচনাভঙ্গি। আরবরা কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের ভাষাগত প্রতিভার দাপট দেখাত। আর তাতে প্রতিযোগিতা চালাত। ক্ষেত্রগুলো হলো, কবিতা, বক্তৃতা, পত্রাবলী এবং কথাবার্তা। এ চারটি ছাড়া সাহিত্য প্রতিভা প্রকাশের আর কোন পথ ছিল না। নতুন কোন পথ বের করারও তাদের যোগ্যতা ছিল না। এ পরিস্থিতিতে আরবে উম্মী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ নতুন এক বর্ণনারীতি ও ভাষাভঙ্গি প্রকাশ করে অবশ্যই একটি অসাধারণ মু'জিযা উপস্থাপন করেছেন।

২. কোন পড়াশুনা ছাড়া আগের ঘটনাবলী না জেনে অতীত জাতির সঠিক বিধি-বিধান ও তাদের সবার কাছে স্বীকৃত অবস্থার ঠিক ঠিক বর্ণনা দেয়া কি আশ্চর্যের ব্যাপার নয়? এটাও মু'জিযা।

৩. ঠিক তেমনি ভবিষ্যতে কি ঘটবে আর কি ঘটবে না, এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর দেয়া কি মু'জিযা নয়? এটা কি আশ্চর্যজনক নয়? শুধু আশ্চর্য নয় বরং আশ্চর্যের একটা ধারা। যেন মানুষ যুগে যুগে এসব ভবিষ্যৎ বাণীর সত্যতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।

৪. ভাষা অলংকারের সমুন্নত অবস্থান। যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আমরা যেহেতু প্রাচিন আরবী সাহিত্যের যুগ থেকে অনেক পরে এসেছি, তাই আরবী ভাষার সৌন্দর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা কম। এজন্য আমরা তার গভীরে পৌছাতে সক্ষম নই তেমনি তার মূল্যায়নও অসম্ভব। তবে এটুকু বলা যায় যে, কুরআন মাজীদের মত এতো উন্নত ও আকর্ষণীয় বাক্য বিন্যাস শব্দের অবাধ প্রয়োগ নতুন ও পুরাতন আরবী সাহিত্যের কোথাও নেই। তবে এ সত্যটি শুধু উঁচুমানের ভাষাবিদ ও সাহিত্য বিশারদগণ অনুভব করতে পারেন। এজন্য যতটুকু সুস্থ বিবেচনা ও সূক্ষ্ম রস অনুভূতি প্রয়োজন তা উচ্চাঙ্গের কবি-সাহিত্যিক ছাড়া আর কারোরই থাকে না।

কুরআনের আরেকটি মু'জিযা হলো, যদিও তার বর্ণনারীতি ও বাচনভঙ্গি সব সময়ই গতিশীল। তারপরও তার নির্ধারিত রীতিতে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। আসলে কুরআনের মর্ম, নিদর্শন ও অবদান বিষয়ে হোক বা ঘটনা বা

www.pathagar.com

বিতর্কমূলক হোক কখনো একই রকম বর্ণনা একাধিক জায়গায় ব্যবহার করা হয়নি। একটি ব্যাপার যতবারই বলা হয়েছে আলাদা রস ও রূপ দিয়ে নতুন আঙ্গিকে বলা হয়েছে। প্রত্যেক জায়গাতেই বর্ণনার অনন্য সৌন্দর্য নষ্ট হয়নি। এমন রচনার ধারে কাছে যাবার কল্পনাও কারো থেকে করা দুষ্কর।

আমার এ আলোচনাতেও যদি কেউ সঠিক ব্যাপারটি বুঝতে অক্ষম হন, তাহলে তারা সূরা আ'রাফ, সূরা হূদ, ও 'সূরা শু'আরার' যে জায়গাগুলোতে আগেকার নবীগণের ঘটনাবলী ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা দেখে নিন। তারপর 'সূরা সফ্ফাতের' কাহিনী সমগ্র এবং 'সূরা যারিয়াত' পড়ুন। এভাবে যখন কেউ একটি ব্যাপার একেক জায়গাতে একেক রকম বর্ণনাভঙ্গি দেখবে তখন তার কাছে এ মূল ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে ধরা দেবে।

ঠিক তেমনি যেখানে পাপীর শাস্তি, নেককারদের পুরস্কৃত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রেও জায়গা বিশেষ নতুন নতুন ভঙ্গিতে উল্লিখিত হয়েছে। অনেক জায়গাতে জাহান্নামীদের সাথে বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। সেখানেও নতুন নতুন বর্ণনারীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ ধরনের উদাহরণ একটা-দু'টো নয় বরং পুরো কুরআনেই এসব ভরপুর। যা বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে।

কুরআন মাজীদ অলংকার সমৃদ্ধ ভাষায়ও বর্ণনা করেছে আবার একদম সাদাসিধে ভাষাও কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছে। এটা করা হয়েছে অবস্থার চাহিদা মাফিক। যেখানে যেমন প্রয়োজন হয়েছে সেখানে তাই করা হয়েছে। এসব ব্যবহারের বিস্তারিত অবস্থা তারা বুঝতে পারবে না যারা সাহিত্যের অলংকার শাস্ত্রের ব্যাপারে বেখবর। রূপক অর্থবোধক বাক্য, ইঙ্গিতসূচক বাক্য ব্যবহার সম্পর্কেও জানতে হলে এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা দরকার। কুরআন তার শ্রোতাদের অলংকার শাস্ত্রে অজ্ঞতা এবং এমন বক্তব্য সম্পর্কে বেখবর থাকা সত্ত্বেও এসব অলংকারিক কথামালাকে আশ্চর্যজনক আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছে যে, সব ধরনের মানুষই তা সমানভাবে বুঝতে পেরেছে এবং গ্রহণ করেছে। এভাবে সবদিক ঠিক রেখে এমন অনুপম রচনা সৃষ্টি আসলেই এক মু'জিযা। আর আল্লাহ তা'আলা তো সর্বশক্তিমান। কবি কী চমৎকারই না বলেছেন :

يَزِيْدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا

اِذَا مَا زِدْتَهُ نَظْرًا

যতই গভীর দৃষ্টিতে তাকাবে ততই তার চমৎকারিত্ব বেশি করে ফুটে উঠবে।

www.pathagar.com

৫. পবিত্র কুরআন যে যুগ-যুগান্তরের বিস্ময়, এটা যে সার্বজনীন মু'জিযা, তার আরেকটি দিক হলো কুরআনে বর্ণিত পঞ্চইল্‌ম। তবে এ দিকটি বিধি-বিধানের গূঢ় রহস্য ও অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা গভীরভাবে চিন্তা গবেষণাকারীগণ ছাড়া অন্য কারো জন্য অনুধাবন করা সহজ নয়। এ পঞ্চইল্‌মই প্রমাণ করে যে, কুরআন মাজীদ নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এটা নাযিল হয়েছে বনী আদমের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে। যেমন, একজন বিজ্ঞ ডাক্তার যখন ইবনে সীনার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল্-কানুন' অধ্যয়ন করেন এবং গভীরভাবে দেখেন সেখানে বর্ণিত বিভিন্ন রোগের কারণ এবং তার আলামতসমূহ এবং তিনি যে, তার জন্য প্রতিশেধক ঔষধ বাতলে দিয়েছেন এবং সে ঔষধের যে বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে পাঠক অভিজ্ঞ ডাক্তার নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবেন যে, অবশ্যই এর লেখক চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ একজন পথপ্রদর্শক, ঠিক তেমনি একজন শরীয়তের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন আলিম যখন মানুষের আত্মশুদ্ধির বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং তারপর কুরআনের পঞ্চইল্‌মের বিশদ জ্ঞান আহরণ করবেন তখন তিনি সন্দেহাতীতভাবে অনুধাবন করতে পারবেন যে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে বিষয়সমষ্টি যেভাবে প্রয়োজন ছিল, কুরআন মাজীদে ঐ বিষয়গুলো ঠিক সেভাবেই বিবৃত হয়েছে। এর চেয়ে বেশি চমৎকারিত্বের কল্পনাও করা যায় না।

কবির ভাষায় :

اَلشَّمْسُ سَاطِعَةٌ تَدُلُّ بِنَفْسِهَا عَلٰى نَفْسِهَا ـ فَاِنْ كُنْتَ فِىْ حَاجَةٍ اِلَى الدَّلِيْلِ فَلاَ تُوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهَا ـ

মোটকথা, কুরআন মাজীদ বিস্ময়কর হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করার কাজটি এমন, যেমন কেউ আকাশে সূর্য উদয়ের প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করল। সূর্যের প্রমাণ তো সূর্য নিজেই, আসলে কুরআন মাজীদ বিস্ময়কর হওয়ার দলীল কুরআনের পরতে পরতেই বিদ্যমান, সুতরাং কুরআন যে মু'জিযা তা বুঝতে হলে কুরআনেই চিন্তা গবেষণা করতে হবে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

তাফসীরের রীতিনীতি এবং সাহাবা-তাবিঈগণের এ সম্পর্কিত মতবিরোধের ব্যাখ্যা

মুফাস্‌সিরগণের শ্রেণী

কুরআনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুফাস্‌সিরগণ পদ্ধতিগত দিক দিয়ে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেছেন।

প্রথম দল হচ্ছেন– 'হাদীস বিশেষজ্ঞ মুফাস্‌সির'। তারা আয়াতের মর্মার্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল হাদীস, চাই তা পূর্ণ সনদসহ হোক বা অসম্পূর্ণ সনদে হোক বা তাবিঈ বর্ণিত অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা হোক বা ইহুদীদের বর্ণিত এমন সব ঘটনা হোক যার সততা নির্ণয়ের কোন ভিত্তি নেই– এসবই আয়াতের মর্মার্থের পক্ষে উপস্থাপন করা জরুরি মনে করেন।

দ্বিতীয় দল হচ্ছেন– 'আক্বীদাহ বিশেষজ্ঞ মুফাস্‌সির'। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্বলিত আয়াতের তা'বীল করেন। যেসব তা'বীল 'তানযীয়াহ[১] মাযহাবের' সাথে মেলে না সেগুলোর সাধারণ অর্থ-না নিয়ে তার অর্থ ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আর বিভিন্ন আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিরোধীদের উপস্থাপিত দলীলের জবাব দিয়েছেন।

তৃতীয় দল হচ্ছেন– 'ফক্বীহ মুফাস্‌সির'। তারা আয়াত থেকে বিধি-বিধান খুঁজে বের করেন। একটি ব্যাপারে যে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন তার পক্ষে দলীল প্রমাণ পেশ করবেন এবং অন্যরা যে অবস্থান গ্রহণ করেছেন বা করবেন তার বিপক্ষেও প্রমাণাদি পেশ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। এটা হলো মূলনীতি বিশারদ ফিকাহবিদগণের তাফসীর পদ্ধতি।

চতুর্থ দল হচ্ছেন– 'ব্যাকরণবিদ মুফাস্‌সির'। তারা কুরআনের ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। যে আয়াতের ব্যাপারে তারা যে অবস্থান গ্রহণ করবেন, তার পক্ষে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে যত উদাহরণ আছে তা এনে পেশ করবেন। এর প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক।

---

১. তানযীয়াহ'– আল্লাহর মুতাশাবিহ সিফাতসমূহের মাসলাতে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতানুসারী মাযহাব।

www.pathagar.com

পঞ্চম দল হচ্ছেন– 'আরবী সাহিত্যিক ও অলংকার শাস্ত্রবিদ মুফাস্‌সির' তারা কুরআনের অলংকার শাস্ত্রের সূক্ষ্ম দিকসমূহ ও মর্মার্থের রহস্যাবলী খুঁজে বের করেন এবং কুরআনের ভাষার অলৌকিকত্ব তুলে ধরেন। এসবকে যতভাবে এবং যেটুকু খুলে দিয়ে স্পষ্ট করে তুলে ধরা যায়, তার জীবনপণ সাধনা তারা চালিয়েছেন।

ষষ্ঠ দল হচ্ছেন– 'কিরা'আত বিশেষজ্ঞ মুফাস্‌সির'। কুরআনের বিভিন্ন ধরনের পাঠরীতি নিয়ে তারা আলোচনা করেন। আসলে তাঁরা শুধু তাঁদের ওস্তাদদের থেকে বর্ণিত কিরা'আত পাঠরীতি উদ্ধৃত করেন। তারা বিভিন্ন কিরা'আতের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ব্যাপার নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করতে যাননি।

সপ্তম দল হচ্ছেন– 'তাসাউফ শাস্ত্রবিদ মুফাস্‌সির'। তারা তাদের তাফসীরে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক ব্যাপারগুলো ফুটিয়ে তোলেন। যে আয়াতে এ সম্পর্কিত সামান্য একটু সম্পর্ক খুঁজে পান সেখানেই এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোচনার অবতারণা করেন।

মোটকথা, তাফসীর শাস্ত্রের ময়দান সুপ্রশস্ত বিশাল এক পরিসর। সবাই চান কুরআনে আযীমের মর্মবাণী বুঝতে অথচ তারা একভাবে কুরআন বুঝার বা বুঝাবার চেষ্টা না করে, যার যার চাহিদানুযায়ী আলাদা-আলাদা পথ বেছে নিয়েছেন। যে শাস্ত্রে যে অভিজ্ঞ সেই শাস্ত্রের আলোচনা নিয়ে মত্ত হয়ে গেছেন। নিজ মত ও মতাবলম্বীদের সহায়তাকে কর্তব্য ভেবে ফেলেছেন। ফলে তাফসীরে এতো প্রশস্ততা দেখা দিয়েছে যে, তা বলে শেষ করা দুষ্কর। এভাবে অনেক কিতাব রচিত হয়েছে যা গণনার গণ্ডিতে নিয়ে আসা মুশকিলই বটে।

সমন্বিত তাফসীর গ্রন্থ

একদল মুফাস্‌সির তাদের তাফসীর গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত সবগুলো বিষয় একত্রিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাদের কেউ তা আরবী ভাষায় লিখেছেন আবার কেউ ফারসী ভাষায়। কেউ সংক্ষিপ্তভাবে করেছেন আবার কেউ বিস্তারিত। এভাবে তারা ইলমের আঁচলকে সুবিস্তৃত করেছেন।

তাফসীর শাস্ত্রে আমার প্রতি আল্লাহর দান

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। তার অসীম করুণায় তিনি এ অধম ফকিরকে উপরোল্লিখিত সবগুলো শাস্ত্রের সাথেই একটা সম্পর্ক দান করেছেন। শাস্ত্রগুলোর অধিকাংশ মূলনীতি এবং তার বিভিন্ন বিভাগের বিস্তারিত জ্ঞান আয়ত্ত করেছি। এর প্রত্যেকটি অধ্যায়ে গভীর গবেষণা চালিয়ে স্বাতন্ত্র্যতা লাভে আমি কৃতকার্য হয়েছি। যাকে 'মাযহাবের গণ্ডির সীমানায় নব উদ্ভাবন ক্ষমতা'[১] (اجتهاد فى المذهب)

---

১. নিজের ইমামের নির্ধারিত মূলনীতি ঠিক রেখে তারই আলোকে শরীয়তের দলীল প্রমাণ সাপেক্ষে মাসাইল উদ্ভাবন করার যোগ্যতাকে اجتهاد فى المذهب বলে।

www.pathagar.com

বলা যায়। আল্লাহ তা'আলার দানের সমুদ্র থেকে আমার মনে উল্লেখকৃত বিষয়গুলো ছাড়াও তাফসীর বিষয়ে অতিরিক্ত আরো কতক শাস্ত্রের স্রোত প্রবাহিত করা হয়েছে।

সত্য বলতে কি, আমি পবিত্র কুরআনের সরাসরি ছাত্র। মুফাস্‌সির বা তাফসীর গ্রন্থের সহায়তা ছাড়াই আমি পবিত্র কুরআন থেকে সরাসরি উপকৃত হই। তেমনি আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আত্মা থেকে সরাসরি উপকৃত হই। ওয়ায়েস কারনী (র.) যেভাবে নবীজির আত্মা থেকে আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হতেন। তেমনি আমি কাবা শরীফ এবং নামায দ্বারাও কোন মাধ্যম অবলম্বন না করেই উপকৃত হই, প্রভাবিত হই।

আমার প্রতিটি লোমের গোঁড়ায় যদি একটি করে জিহ্বা থাকত। আর ঐ সবগুলো জিহ্বা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে থাকি তারপরও প্রশংসা করে শেষ করতে পারব না।

আমি প্রয়োজন বোধ করছি, উল্লিখিত তাফসীরের প্রকারগুলো সম্পর্কে কিছু আলোচনা পেশ করি। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহাদ্দিস আলিমগণের তাফসীরে বর্ণিত হাদীস এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়

শানে নুযূল

হাদীস বিশারদ মুফাস্‌সিরগণের তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে কিছু হাদীস শানে নুযূল সম্পর্কিত। শানে নুযূল দুই প্রকার :

এক. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোন ঘটনা ঘটলে তা দিয়ে মুমিনদের ঈমান ও মুনাফিকদের মুনাফিকী পরীক্ষা ঘটেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রশংসা ও মুনাফিকদের নিন্দামূলক আয়াত অবতীর্ণ করেন। যেন উভয়ের কাজের ধরন সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং দুই দলকে আলাদা করে চেনা যায়। এ ধরনের আয়াতে এমন অনেক ইঙ্গিত থাকে, যা ঘটনার বিভিন্ন সূত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ অবস্থায় ঘটনাটি না জেনে আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করা অসম্ভব।

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে মুফাস্‌সিরগণের জন্য জরুরি। তারা ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করবেন। যেন পাঠকরা আয়াতের সূত্র জেনে তার মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারেন।

দুই. শানে নুযূলের দ্বিতীয় প্রকার হলো, যাকে উপলক্ষ্য করে আয়াত অবতীর্ণ হয় কিন্তু আয়াতের মর্মের সাথে ঘটনার বাহ্যত কোনই সম্পর্ক নেই। যেসব আয়াতে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়। তার সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাগুলোই এর আওতাভুক্ত। এসব আয়াত বুঝার জন্য সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী জানার প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং এমন ধরনের আয়াতের ব্যাখ্যার বেলায় তার শানে নুযূল বর্ণনার প্রয়োজন হয় না।

তারপরও আগেকার মুফাস্‌সিরগণ এসব ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন ভাবতেন। হয়ত এজন্য যে, কেমন পরিস্থিতিতে এ বিধানটি প্রযোজ্য তা বুঝানোর জন্য।

সাহাবায়ে কিরামের ধারা

শানে নুযূল সম্পর্কে অধমের গবেষণায় যা ধরা পড়েছে তা হলো, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈ অনেক সময় বলে থাকেন- نَزَلَتِ الْاٰيَةُ فِىْ كَذَا অর্থাৎ 'আয়াতটি অমুক ঘটনায় নাযিল হয়েছে'। এটা বলে তাঁরা শুধু আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ঘটনাটিই বুঝাতেন না বরং আয়াতটি যে সব ঘটনায় প্রযোজ্য সেগুলোর ব্যাপারেও এমনটি বলতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হতো, আয়াত দ্বারা যা যা বুঝা যেতে পারে, তারও উল্লেখ করা। তাঁরা এটা মনে করতেন না যে, ঘটনাটি আয়াতের আগে ঘটেছে নাকি পরে এবং এর সম্পর্ক বনী ইসরাঈলের সাথে আছে? নাকি জাহিলী চেতনার সাথে? না ইসলামী যুগের সাথে? এমনকি ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট আয়াতের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক রাখে কিনা? তাও তারা চিন্তা করতেন না।

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল, তাফসীরের শানে নুযূল বিষয়টি শুধু নবীজির হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের ব্যক্তিগত মতামত এবং গবেষণাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, একই আয়াতের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের একাধিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যা আয়াতের বিধানের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত নয়।

এ দু'টো ব্যাপার খেয়াল করলে শানে নুযূলের ক্ষেত্রে যত সমস্যাই দেখা দিক না কেন, একটু চিন্তা করলেই সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

এখানে ঘটনার বিস্তারিত আলোচনার বিষয়টিও লক্ষণীয়। কুরআন মাজীদ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ছেড়ে শুধু ইংগিত দিয়েই সামনে চলেছে। মুফাস্‌সিরগণ যখন এমন আয়াতের ব্যাপারে তাফসীর করেন তিনি বিস্তারিত ঘটনার অবতারণা করেন। এর জন্য তাঁরা ইহুদীদের ইতিহাস গ্রন্থ খুলে ঘটনার বিবরণ আহরণ

www.pathagar.com

করেন। অথচ কুরআনের সবগুলো ইংগিতই বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রাখে না। অনেক আয়াতের মর্ম সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ছাড়া শুধু ইংগিতে বুঝা যায় না। সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা মুফাস্‌সিরদের জন্য জরুরি বটে। কিন্তু যেগুলো এ ধরনের নয় যেমন, বনী ইসরাঈলের গরুটি গাভী ছিল না বলদ ছিল, আসহাবে কাহাফের কুকুর লাল ছিল না কালো ছিল? এসব অযথা আলোচনা। সাহাবায়ে কিরাম এ ধরনের আলোচনাকে অন্যায় এবং সময়ের অপচয় নামান্তর ভাবতেন। এখানে দু'টো কথা লক্ষণীয় :

এক. কুরআনের ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন রকম অনুমানের আশ্রয় নেয়া অনুচিত। যেভাবে ঘটনা পাওয়া গেছে, সেভাবেই বলে দেয়া উচিত। অথচ পূর্বেকার একদল মুফাস্‌সির নতুন পন্থা অনুসরণ করেছেন। তারা কুরআনের ইংগিতকে পুঁজি করে তার আলোকে মোটামুটি অনুমান নির্ভর ও সংশয়পূর্ণ আলোচনার অবতারণা করতেন। পরিণামে পরবর্তী মুফাস্‌সিরগণ ঐ সংশয়পূর্ণ ঘটনাটিকে সূত্র হিসেবে পেশ করে নিশ্চিত বলে চালিয়ে দিলেন।

যেহেতু বিভিন্ন ধরনের কথার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনারীতি নির্ধারণ করা হয়নি। তাই সন্দেহপূর্ণ কথা ও নিশ্চিত কথা মিলে জগাখিচুড়ির মত হয়ে গেছে। ফলে সন্দেহপূর্ণকে নিশ্চিত এবং নিশ্চিতকে কখনো সন্দেহপূর্ণ ধরে নেয়া হয়েছে। আসলে ঘটনা বর্ণনা করার এ নিয়ম এবং অনির্ধারিত বর্ণনা পদ্ধতি ও সত্যের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করে। তাফসীরের এ অংশটিও ব্যক্তিগত গবেষণা ও অনুমান নির্ভরতা থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং এখানে বিবেচনা ও বিতর্কের বিরাট সুযোগ থেকে যায়। যারা এ কথাটি মনে রাখবেন, তাদের ক্ষেত্রে মুফাস্‌সিরদের মতবিরোধের আসল ব্যাপারটি বুঝা এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হবে না। তারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, আলোচ্য সমস্যাটি সাহাবায়ে কিরাম-এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয় এবং এটা তাদের ইলমী গবেষণা, যেমন মুজতাহিদগণ নিজেদের মাঝে আলোচনা করেন এবং ব্যক্তিমত প্রকাশ করেন।

আমার মতে ওযুর ক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতটি ঠিক তেমনি, মহান আল্লাহ বলেন :

وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -

"এবং তোমাদের মাথা মুছে ফেল ও পায়ের গিরা পর্যন্ত।" (মায়িদা-৮)

আয়াতটি সম্পর্কে তিনি বলেন– আমি আল্লাহর কিতাবে মাসেহ ছাড়া অন্য কোন

www.pathagar.com

নির্দেশ পাই না। কিন্তু লোকেরা ধোয়া ছাড়া অন্য কিছুকে অস্বীকার করেছে। আসলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথা থেকে আমি যা বুঝেছি তা হলো, তিনি পা মাসেহ করার মত পোষণ করতেন না। ওযুর শর্তও মনে করতেন না। তাঁর মতও ছিল পা ধৌত করা জরুরি। এখানে তিনি শুধু সমস্যাটির দিকে ইংগিত করেছেন যা আয়াতের বাহ্যিক বিন্যাস প্রকাশ করে। এটা বলে তিনি তাঁর সমসাময়িক মুফাস্‌সিরগণের মতামত জানতে চেয়েছেন। অথচ যারা তার এ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেখবর এবং তাঁদের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা রাখতেন না, তারা এ উক্তিকে তাঁর মত ও মাযহাব ধরে নিয়েছেন যে, তিনি পা মাসেহ করার মত পোষণ করতেন। অথচ এটা সত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে ষড়যন্ত্রমূলক ইহুদী বর্ণনার অনুপ্রবেশ

দুই. দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা জরুরি। তা হলো, আমাদের তাফসীর গ্রন্থগুলোতে অনেক ইহুদীদের বর্ণনা ঢুকে পড়েছে। তাদের বর্ণনার সূত্র ধরে অনেক ঘটনার তাফসীর উপস্থাপন করা হয়েছে। অথচ নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : لَا تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَاتُكَذِّبُوْهُمْ ـ

"তোমরা আহলে কিতাবদের না সত্যবাদী বল না মিথ্যাবাদী বল।"

হাদীসখানার মর্মার্থ অনুযায়ী ইহুদীদের বর্ণনাসমূহের ব্যাপারে আমরা কোন মন্তব্য করব না। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের দু'টো মূলনীতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

এক. কুরআনের সংক্ষিপ্ত ইংগিতের ব্যাখ্যা যখন হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনায় পাওয়া যাবে, তখন ইহুদীদের ইসরাঈলী বর্ণনার দিকে তাকানোই যাবে না।

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ـ

"আমি পরীক্ষা করলাম সুলায়মানকে এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড় (শরীর)। তারপর সুলায়মান আমার দিকে ধাবিত হলো।" (সোয়াদ-৩৪)

এ আয়াতের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে– কোন ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। আর এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে ধরে ফেলেন। অথচ ইহুদীরা এ আয়াত

www.pathagar.com

প্রসঙ্গে পাথর ও সাপের কাহিনীর অবতারণা করেছে। এসব ক্ষেত্রে নবীজির বর্ণনার সামনে তাদের বর্ণনার বৈধতা কতটুকু?

দুই. ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে এ বিখ্যাত প্রবাদটি স্মরণ রাখা দরকার। যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু চাই অর্থাৎ কুরআনের ইঙ্গিতের সাথে যেটুকু ঘটনা সম্পৃক্ত থাকে, ঠিক ততটুকু বর্ণনা করা উচিত। ফলে কুরআনেও তার সমর্থন পাওয়া যাবে। অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করতে হবে।

কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর

এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি কথা জানা থাকা প্রয়োজন। তা হলো, কুরআন মাজীদের কোথাও একটি ঘটনা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ থাকে। আবার অন্য জায়গায় ঐ ঘটনাটিই একটু বিস্তারিত আলোচিত হয়। সুতরাং তাফসীরের ক্ষেত্রে কোন সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়ার পর কুরআন মাজীদেই দেখতে হবে যে, অন্য কোথাও তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে কিনা, যদি কুরআনেই তার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় তাহলে ঐ বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েই সংক্ষিপ্ত আয়াতের ব্যাখ্যা বা তাফসীর করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ـ

"আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" (বাকারা-৩০)

তার দু'টো আয়াত পরেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ـ

"আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবগত। আর তোমরা যা প্রকাশ কর এবং গোপন রাখ তাও আমি জানি।" (বাকারা-৩৩)

দেখুন! প্রথম কথাটিই এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং প্রথম আয়াতের তাফসীরে পরবর্তী আয়াতকে উপস্থাপন করা উচিত।

আরেকটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক। সূরা মারইয়ামে সায়্যিদিনা হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ـ

www.pathagar.com

"আর আমি তাকে মানুষের জন্য নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ করতে চাই। আর এটা তো সুনির্ধারিত ব্যাপার।" (সূরা মারইয়াম-২১)

এ আয়াতটিকেই আরো বিস্তারিতভাবে খুলে বলা হয়েছে– সূরা আলে ইমরানে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَرَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا ۢبِاِذْنِ اللّٰهِ ج وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

"আর তাঁকে (ঈসা (আ.)কে) বনী ইসরাঈলের জন্য এমন রাসূল বানাবেন যিনি তাদেরকে এ সংবাদ দেবেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য কাদা দিয়ে পাখির মত আকৃতি তৈরী করব, তারপর তাতে ফুঁক দেব। ফলে তা আল্লাহর নির্দেশে পাখি হয়ে যাবে। আর আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করব এবং আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করব। তোমরা যা খাও এবং নিজেদের ঘরে যা মওজুদ কর আমি তা তোমাদেরকে বলে দেব। এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও।" (আলে ইমরান-৪৯)

এ আয়াতে সুসংবাদটি কি তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আর পূর্বের আয়াতে সুসংবাদের কথা অস্পষ্টভাবে ইংগিত করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতটি সূরা মারইয়ামের আয়াতের ব্যাখ্যা। এর ভিত্তিতেই আমি

وَرَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنِّىْ .....

-এর অর্থ করি–

وَرَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ مُخْبِرًا بِاَنِّىْ .....

অর্থাৎ– "(আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে) বনী ইসরাঈলের জন্য এমন রাসূল বানাবেন যিনি তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করবেন যে, নিশ্চয় আমি... ।"

আসলে এ মর্মই সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আল্লামা সুয়ূতী (র.) অন্য একটি উহ্য শব্দের সাথে এটাকে জুড়ে দিয়ে এভাবে ব্যাখ্যা করেন :

www.pathagar.com

فَلَمَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ قَالَ لَهُمْ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ بِاَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ......

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাকে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরণ করেন তখন তিনি বললেন- আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত পুরুষ। কারণ আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

আল কুরআনের দুর্বোধ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যায় পূর্বসূরি ওলামায়ে কিরামের মতবিরোধের কারণ ও তার প্রতিকার

কুরআন মাজীদের দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যার ব্যাপারটিও লক্ষণীয় একটি বিষয়। কারণ এটা দু'টো জিনিসের ভিত্তিতে সমাধান যোগ্য। এক. আরবী পরিভাষা পর্যবেক্ষণ করা। দুই. আয়াতের আগে-পরের বক্তব্য অনুধাবন করা, শব্দটি যে বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে, তার অন্যান্য অংশের সাথে এর সম্পর্ক জানা। আর এখানেও বুঝার শক্তির কর্তৃত্ব আছে ফলে মতবিরোধের সুযোগ থেকেই যায়। কারণ আরবদের ভাষায় একটি শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তারপর আবার শব্দের ব্যবহার খোঁজ করার ক্ষেত্রে, আয়াতের আগে-পরের সম্পর্ক বুঝা এবং বাক্যের অন্যান্য শব্দের সাথে আলোচ্য শব্দটির সম্পর্ক বুঝা উঠার ক্ষেত্রেও সবার মেধা একই রকম কাজ করে না। সবাই যার যার পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন হিসেবেই কথা বলেন। ফলে দুর্বোধ্য শব্দগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সাহাবা তাবিঈগণের বক্তব্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। সবাই যার যার মতের দিকে চলেছেন। এমন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ন্যায়বান মুফাস্‌সিরের জন্য দুর্বোধ্য শব্দসমূহের প্রাপ্ত ব্যাখ্যাসমূহকে দুইবার নিরীক্ষণ করা উচিত।

১. আরবদের শব্দ ব্যবহার ও তাদের বাগধারার আলোকে যাচাই করা। যেন এ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, আরবদের কাছে কোন্‌টি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

২. আবার যাচাই করবে আগে-পরের বক্তব্যের আলোকে। যেন প্রাথমিক তথ্যসমূহ সুদৃঢ় করা, শব্দের ব্যবহার খুঁজে দেখা এবং সাহাবা ও তাবিঈদের থেকে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা জানার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, কোন্‌টি সঠিক মর্মার্থের নিকটতম এবং সর্বোত্তম।

www.pathagar.com

দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যায় আমার গবেষণা

অধম এক্ষেত্রে আলোচিত মূলনীতির আলোকে টাটকা কিছু গবেষণাধর্মী তথ্য উদ্ভাবন করেছি। যার সূক্ষ্মধর্মীতা ও যথার্থতা সুস্পষ্ট। যা পক্ষপাত দুষ্ট মনোভাব না থাকলে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যেমন– মহান আল্লাহ বলেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ـ

মুফাস্‌সির ওলামায়ে কিরাম আয়াতের قِصَاصٌ শব্দের অর্থ করেছেন– হত্যার প্রতিশোধে হত্যা। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়– হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি প্রতিশোধস্বরূপ হত্যার বিধান দেয়া হয়েছে।

কিন্তু আমি এখানে 'কিসাস' শব্দের আভিধানিক অর্থ ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ– قِصَاصٌ অর্থ হলো– اَلتَّكَافُؤُ বা সমতা। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়– হে মুমিনগর্ণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি সমতা রক্ষার বিধান দেয়া হয়েছে। আয়াতের পরবর্তী অংশে রয়েছে–

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ـ

অর্থাৎ– "স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী।"

সাধারণ মুফাস্‌সিরগণ আয়াতে এ অংশের বিপরীত অর্থ-[১] রহিত হয়ে গেছে বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু আমি যেহেতু 'কিসাস' শব্দের অর্থ 'সমতা' করেছি। সুতরাং আমার মতে বিপরীত অর্থ রহিত হয়ে গেছে বলার প্রয়োজন নেই। এতে এ ধরনের কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করা লাগবে না। যা সামান্য চিন্তা করলেই অর্থহীন মনে হবে।

২. তেমনি আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ـ

অর্থাৎ– "তারা তোমাকে চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বল, এটা মানুষের জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।" (সূরা বাকারা-১৮৯)

---

১. বিপরীত অর্থ (مفهوم مخالف) বলতে যা বুঝানো হয়েছে, তা হলো– স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যাকারী ক্রীতদাস হলে সে ক্রীতদাসকে হত্যা করাকে অবৈধ ভাবা। স্বাধীন নিহত ব্যক্তির বদলে হত্যাকারী যেই হোক স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা। তেমনি ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে এবং নারীর ক্ষেত্রে। এটা হলো বিপরীত ব্যাখ্যা। যা জাহিলি যুগে প্রচলিত ছিল।

www.pathagar.com

আমার মতে يَسْئَلُوْنَكَ عَنْ اَشْهُرِ الْحَجِّ বাক্যটি يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে– তাঁরা তোমাকে হজ্জের মাসসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বল সেগুলো মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক। দেখতে প্রশ্নোত্তরের মাঝে সামঞ্জস্য নেই এমন অর্থ নেয়া হলে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়।

৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ.

"তিনিই বের করে দিয়েছেন আহলে কিতাব কাফিরদেরকে তাদের ঘর থেকে প্রথম সমাবেশের সময়।" (সূরা হাশর-২)

আমি আয়াতটিতে উল্লিখিত لِاَوَّلِ الْحَشْرِ-এর অর্থ করেছি– لِاَوَّلِ جَمْعِ الْجُنُوْدِ। অর্থাৎ সৈন্যদের প্রথম সমাবেশের সময়। প্রথম ধমকেই তারা ভয় পেয়ে গেছে। প্রথম ধাক্কাতেই ঘরবাড়ী এবং দুর্গ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। কোন দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়নি। নীচের দু'টো আয়াতের দৃষ্টিতে আমি এমন মর্মার্থ নিয়েছি। আয়াত দু'টো হলো–

ক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ـ

"তারা বলল– তাকে এবং তার ভাইকে অবকাশ দিন এবং শহরগুলোতে সংগ্রহকারী পাঠিয়ে দিন।" (শু'আরা-৩৬)

খ. আরেকটি আয়াতে ইরশাদ করেন : وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ.

"সুলায়মানের সামনে তার বাহিনীকে সমবেত করা হলো।" (নাম্‌ল-১৭)

এ দু'টো আয়াতে حَشْرٌ শব্দটি উল্লিখিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ অর্থ নিলেই বনু নযীর গোত্রের ঘটনার সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল হবে। তাছাড়া আল্লাহর করুণা প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশি সহায়ক সাব্যস্ত হবে।

রহিতকরণের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামার মতভেদ

আয়াতের নাসিখ (রহিতকারী আয়াত) ও মান্‌সূখ (রহিতকৃত আয়াত)-এর ব্যাখ্যার ব্যাপারটিও একটি জটিল বিষয়, কারণ এর সঠিক ধারণা না থাকলে

www.pathagar.com

আয়াতের মর্ম অনুধাবনও জটিলতার মুখোমুখি হয়। সুতরাং এখানে যত জটিল ব্যাপার আছে তাও বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, নাস্‌খ শব্দটি বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণ এক অর্থে, মুহাদ্দিসগণ আরেক অর্থে এবং উসূলী বা মূলনীতি নির্ধারকগণ আরেক অর্থে ব্যবহার করেছেন। একটি শব্দের তিনটি অর্থ হলে তাতে জটিলতা সৃষ্টি হতেই পারে। আর তাই হয়েছে। নাস্‌খ শব্দের আভিধানিক অর্থ– إِزَالَةُ বা দূরীকরণ।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণ 'নাস্‌খ' শব্দটিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করতেন অর্থাৎ– কোন কিছু দূর করা বা বিলোপ করা। আভিধানিক এ অর্থ হিসেবে 'নাস্‌খ' অর্থ হবে– কোন আয়াতের নির্দেশকে অন্য আয়াত দ্বারা রহিত করা বা বাতিল করা। আর এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। হয়তো পরে নাযিলকৃত আয়াত দ্বারা এটা বলে দেয়া হবে যে, এর উপর আমল করার সময় পার হয়ে গেছে। অথবা পরের আয়াতে এমন কোন কথা থাকে, যার কারণে পূর্বের আয়াতের সাধারণ হুকুমের পরিবর্তে ধারণা অন্যদিকে ধাবিত হয়। এসব অবস্থায় প্রথম আয়াতের বিধানটি এমনিতেই রহিত হয়ে যায়। কখনো রহিত হওয়ার আরেকটি পদ্ধতিও দেখা যায়, পরবর্তী আয়াতে বিশেষ ধরনের শর্তারোপের কারণে পূর্বের আয়াতের ব্যাপক নির্দেশটি সীমিত হয়ে যায়। এখানে পূর্বের আয়াত যা ব্যাপকার্থে ছিল, তাকে মান্‌সূখ বলা হয়। কোথাও আবার পরের আয়াতে এমন তথ্য পাওয়া যায় যার কারণে আগের আয়াতে অস্পষ্ট অর্থটি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

এটা এমন এক বিষয় যাতে মানুষের বুদ্ধি খাটানোর অনেক সুযোগ আছে। যার কারণে অনেক মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং রহিত বা মান্‌সূখ আয়াতের সংখ্যা পাঁচ শততে দাঁড়িয়েছে।

মান্‌সূখ আয়াতের ব্যাপারে দ্বিতীয় লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, সবকিছু নির্ভর করে আয়াত নাযিলের সময় জানার উপর। সাহাবায়ে কিরামের ব্যবহারে রহিতকরণ বিষয়টি যত অর্থ প্রকাশ করেছে, তা থেকে এটা ঠিক করা কঠিন যে, কোন্‌টি প্রকৃত অর্থে মান্‌সূখ আর কোনটি মান্‌সূখ নয়। সুতরাং প্রকৃত মান্‌সূখ ঠিক করার জন্য আয়াত নাযিলের সময় সামনে রাখতে হবে। কখনো পূর্বসূরিগণের সর্বসম্মত মতকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করা হয়। আবার কখনো ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতকে মান্‌সূখ নির্ধারণের ভিত্তি বানানো হয়। সাধারণের কথা বাদই দিলাম, বড় বড় ফিকাহবিদ, ওলামায়ে কিরামও এ পথই অনুসরণ করেছেন। অথচ যে

www.pathagar.com

ব্যাপারে সর্বসম্মত মত বা ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আসলে ব্যাপারটি অন্য রকম হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

মোটকথা, হাদীসের গ্রন্থগুলোতে তাফসীর অধ্যায়ে মুহাদ্দিস ওলামায়ে কিরাম 'রহিতকরণ'-এর ব্যাপারে যেসব হাদীস উপস্থাপন করেছেন, তার গভীরতা এতো যে, শেষ সীমায় পৌঁছা খুবই কঠিন।

মুহাদ্দিস মুফাস্‌সিরগণের বর্ণিত আরো কিছু বিষয়

হাদীস গ্রন্থসমূহের তাফসীর অধ্যায়গুলোতে শানে নুযূল, বুঝা কঠিন এমন শব্দগুলোর ব্যাখ্যা এবং রহিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যত হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে, সে সম্পর্কে এতক্ষণ আলোচনা হলো। তাঁদের তাফসীর অধ্যায়সমূহতে এ ছাড়াও আরো কিছু ব্যাপার দেখা যায়। যেমন–

ক. হাদীসে সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের মতানৈক্যে প্রমাণ বা উদাহরণ হিসেবে কোন আয়াত উল্লেখ করেছেন।

খ. হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণীর প্রমাণ হিসেবে কোন্ আয়াত তিলাওয়াত করেছেন।

গ. মুফাস্‌সির আলিমগণ কোন্ আয়াতের অধীনে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এজন্য যে, হাদীসখানা আয়াতের মর্মার্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

ঘ. কোন্ কোন্ হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম থেকে কুরআনের কোন্ কোন্ শব্দের উচ্চারণ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

বিধি-বিধান আহরণ

এ অধ্যায়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার ছিল তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো মাসআলা মাসায়েল বের করা কুরআনের আয়াত থেকে। যাকে পরিভাষায় ইস্তেম্বাত বলা হয়। বিষয়টি খুবই বিশ্লেষণধর্মী। কোন্ আয়াত থেকে কোন্ বিধি-বিধান জানতে হলে আয়াতের মর্মবাণী, ইশারা-ইঙ্গিত ও তার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, ভালভাবে এসব বুঝতে হবে। সুতরাং এটা বিচার-বিশ্লেষণের বিশাল একটা ময়দান। এজন্য ফকীহ ওলামায়ে কিরামের মধ্যে এখানে অনেক মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে কুরআন হাদীস থেকে

www.pathagar.com

আহরণ করা বিধানসমূহ দশটি ভাগে বিভক্ত করার ইলহাম করেছেন। এই দশ প্রকার কোন্‌টির পর কোন্‌টি হবে অর্থাৎ তার ধারাবাহিকতার জ্ঞানও দান করেছেন। এগুলোকে সাজিয়ে আমি একটি গ্রন্থও রচনা করেছি। মাসাইল আহরণ করার বিধি-বিধানগুলো যাচাই করার জন্য গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাওজীহ

কুরআন মাজীদ তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হলো– তাওজীহ বা বিশ্লেষণ। এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয়। এর অনেক প্রকার প্রকরণ, শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ব্যাখ্যাকারগণ তাদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করে থাকেন। তবে পাঠকের শ্রেণী হিসেবে ব্যাখ্যাও বিভিন্ন স্তরের করা হয়। বুঝা গেল ব্যাখ্যাও একই ধরনের হয় না। তাই মর্মার্থ ঠিক করা ও বিধি নিষেধ আহরণ করতে গিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। সাহাবায়ে কিরামের যুগে 'তাওজীহ' বিশেষ কোন শাস্ত্রের রূপ লাভ করেনি। তার কোন নীতিমালাও ছিল না। তারপরও তাঁরা কুরআনের আয়াত ব্যাপকভাবেই বিশ্লেষণ করে গেছেন। জটিলতার সমাধানকেই আসলে তাওজীহ বলা হয়। যেমন– একজন লেখকের লেখায় যখন কোন জটিল জায়গা আসে, তখন ব্যাখ্যাকার সেটাকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করেন বা খুলে খুলে বর্ণনা দেন, যেন সবাই ব্যাপারটি অনায়াসে বুঝে নিতে পারেন। এটাকেই আরবীতে তাওজীহ বলে।

কিন্তু আরেকটি ব্যাপার হলো, সব পাঠকই কিন্তু একই স্তরের নয়। সবার বুঝার শক্তি সমান নয়। তাই একই ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সবার জন্য সহজবোধ্য নয়। নবীন পাঠকদের জন্য ব্যাখ্যার ধারা ভিন্ন হতে হবে। আর অভিজ্ঞদের জন্য হবে ভিন্ন। একটি বিষয় নবীনদের জন্য সহজবোধ্য না হলেও প্রবীণদের জন্য সহজ হতে পারে। আর অভিজ্ঞদের জন্য যা কঠিন তা নবীনদের ক্ষেত্রে তো কল্পনাও করা যায় না।

উত্তম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধারা

অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গরা নবীনদের মননকে সামনে রেখে তাদের মগজের ধারণ ক্ষমতার নিরীখেই ব্যাখ্যা পেশ করে থাকেন। যেসব আয়াতে মতবিরোধের ব্যাপার আছে তা ব্যাখ্যার উত্তম উদ্ধৃতি হলো, সংশ্লিষ্ট সব মত ও পথগুলো আগে ব্যাখ্যা করা। তারপর বিভিন্ন মতাবলম্বীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর পুরোপুরি যাচাই করা। আর যেসব আয়াত বিধি-বিধান সম্পর্কিত, সেসব আয়াতের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া হবে– বিধি-বিধানের যতগুলো ধরন হতে পারে, তার

www.pathagar.com

সবই উল্লেখ করবে। তার ভেতর যত শর্ত শরায়েত ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করবে। স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে যে, এসব থাকা বা না থাকাতে পরিণাম ফল কি দাঁড়ায়? এমনভাবে সবগুলো বিষয় আলোচনা করবে যে, মূল মাসআলাটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

যেসব আয়াত আল্লাহ তা'আলার অবদান সম্পর্কিত সেগুলো ব্যাখ্যা করার ধরন হবে– অবদানগুলো এমনভাবে খুলে বর্ণনা করবে যে, তার একটা চিত্র ফুটে উঠে। কোন দিক যেন অস্পষ্ট না থাকে। যেসব আয়াত কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা সম্বলিত সেগুলো ব্যাখ্যা করবে এভাবে যে, একই ধরনের সব ঘটনা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করবে। আর তাতে যত ইশারা-ইঙ্গিত এবং রহস্যময় কথা আছে তা সবই খুলে খুলে বর্ণনা করে দেবে।

যেসব আয়াত মৃত্যু এবং তার পরের অবস্থা সম্পর্কিত, তা এমনভাবে ব্যাখ্যা করবে, যেসব অবস্থা দেখা দেবে বলে প্রমাণিত আছে, তা খুলে বিশ্লেষণ করবে।

এতক্ষণ বিশ্লেষণের একটি ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। বিশ্লেষণের আরো অনেক ধারা আছে। যেমন, কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে কঠিন হওয়ার কারণে অসামঞ্জস্য মনে হলো। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যার ধারা হবে– এর মতো উদাহরণ উপস্থাপন করে পাঠকের ধারণার কাছাকাছি নিয়ে যাবে। দু'টো স্ববিরোধী প্রামাণ্য আয়াতের জন্য যদি বুঝতে কষ্ট হয় তাহলে ব্যাখ্যার সময় উভয় আয়াতের এমন ব্যাখ্যা দিবে যেন কোন বিরোধ না থাকে।

দু'টো আয়াতের অর্থ যদি স্ববিরোধী হয়ে দেখা দেয় বা প্রকাশ্য অর্থের সাথে যুক্তিগত বিরোধ দেখা দেয়। তাহলে এখানেও বিরোধ মিটিয়ে দিতে সক্ষম এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে। দু'টো পৃথক ব্যাপার মিলে যদি জগাখিচুড়ি হয়ে যায়, সেখানেও ভুল সৃষ্টির কারণ দূর করে দেয়ার জন্য সহায়ক ব্যাখ্যাই তুলে ধরবে। যদি একটি আয়াত আলাদা দু'টো বিধানের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়, তখন সে দু'টো বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্যের দিকটি তুলে ধরবে। কোথাও কোথাও বিশ্লেষণের ধারা এটাও হতে পারে যে, আয়াতে যেসব ওয়াদার কথা উল্লিখিত হয়েছে তার সত্যতা এবং অবশ্যম্ভাবিতা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করবে। বিশ্লেষণের আরেকটি ধরন হলো, কোন ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে এর উদাহরণ পেশ করে ব্যাপারটি প্রমাণিত সত্য হিসেবে তুলে ধরবে।

মোটকথা, সাহাবায়ে কিরামের তাফসীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অনেক নজির রয়েছে। আসলে বিষয়টি সব সমস্যার সঠিক কারণ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন না করে সঠিকভাবে বুঝানো সম্ভব নয়। ব্যাখ্যা করে সব বিষয়ের সমাধান বের করে দিতে পারলেই এ বিষয়টির আলোচনা সফল হয়েছে বলা যাবে।

www.pathagar.com

আকীদাহ্ বিশেষজ্ঞ ওলামাগণের বাড়াবাড়ি

মুতাশাবিহ্ আয়াত বা দুর্বোধ্য মর্মার্থ বিশিষ্ট আয়াতের তা'বীল এবং আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহের মর্মার্থ নির্ধারণে তা'বীল করা, এটা আমার মাযহাব নয়। বরং আমি এক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র.), সুফিয়ান সাওরী (র.) ইবনে মুবারক (র.) এবং সকল পূর্বসূরি ওলামায়ে কিরামের মাযহাব অনুসরণ করি। মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে তার প্রকাশ্য অর্থ অনুসরণ করা উচিত। সেটা নিয়ে গবেষণা ও তা'বীলের প্রশয় না নেয়াই ভাল।

কুরআনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ

কুরআন থেকে আহরিত বিধি-বিধানের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ করা, নিজের মাযহাব প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যের মাযহাবকে ঘায়েল করা, তাছাড়া কুরআনী দলীল প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করার কৌশল নেয়াও আমার মতে ঠিক নয়। বৈধ পন্থা হচ্ছে, আয়াতের ভাব ও মর্মবাণী অনুসন্ধান করা এবং তাকেই নিজের মত ও মাযহাব নির্ধারণ করা। চাই তার পক্ষের লোকেরা এ মতটি অনুসরণ করুন বা তার বিপক্ষের লোকেরা অনুসরণ করুন তাতে কিছুই আসে যায় না।

কুরআনের অর্থ ঠিক করা

কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত শব্দমালার অর্থ করতে গিয়ে প্রাচিন আরবদের শব্দ ব্যবহার ও তাদের বাগধারা অনুসরণ করতে হবে। তারপরে দেখতে হবে যে, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের ব্যবহার, যে অর্থের ব্যাপারে তাঁরা একমত হয়েছেন, তাই গ্রহণ করবে।

কুরআনের ব্যাকরণ

কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ তত্ত্ব আলোচনার কারণেও কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কেননা একদল আরবী ব্যাকরণ বিদ্যায় ইমাম সিবওয়ায় (র.)-এর অনুসরণ করে, তাঁর মতের বিরুদ্ধে কিছু পেয়েই সম্ভব-অসম্ভব সব রকমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়েছে এবং নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস পেয়েছে আমার মতে এটা অন্যায়। আসলে আয়াতের আকার ইংগিতে যেটা বেশি উপযোগী মনে হবে, তাই অনুসরণ করা উচিত। চাই তা ব্যাকরণবিদ সিবওয়ায়ের অনুকূলে হোক বা অন্য ব্যাকরণবিদ 'ফাররা'-এর অনুকূলে হোক। যেমন একটি আয়াতাংশ দেখুন :

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ ـ

www.pathagar.com

"এবং নামায কায়েমকারী এবং যাকাত আদায়কারী" এ আয়াত সম্পর্কে হযরত উসমান (রা.) বলেন– سَتُقِيْمُهَا الْعَرَبُ بِاَلْسِنَتِهَا ـ

আমার মতে এ বাক্যাংশ দৃশ্যত আরবদের ভাষারীতির বিপরীত হলেও আসলে তা নয়। কেননা আরবরাই আরবী ভাষাকে জন্ম দিয়েছে। তাদের মুখ থেকে যা বের হয় তা-ই ভাষার ক্ষেত্রে প্রমাণ হয়ে যায়। পাশাপাশি এটাও ঠিক যে, আরবরা তাদের কথাবার্তায় অনেক সময় প্রচলিত রীতিনীতির বিপরীতও করে থাকেন। আর এটাকে কেউ অন্যায় ভাবে না। কুরআন মাজীদও প্রাচীন আরবদের ভাষাই নাযিল হয়েছে। তাই কুরআনে কোথাও 'ওয়াও'-এর জায়গায় 'ইয়া' এবং 'ইয়া'-এর জায়গায় 'ওয়াও' উল্লেখ হলে বা দ্বিবচনের জায়গায় একবচন শব্দ এবং পুংলিঙ্গ শব্দের জায়গায় স্ত্রী লিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে দেখলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। মোটকথা আমার মতে اَلْمُقِيْمِيْنَ আসলে اَلْمُقِيْمُوْنَ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, 'আল্লাহ সর্বজ্ঞানী'।

অলংকার শাস্ত্র

আরবীতে এটাকে 'ইলমুল মা'আলী ও 'ইলমুল বদী বলা হয়। এটা শাস্ত্রের রূপ লাভ করেছে তখন, যখন সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের যুগ অতিক্রম করেছে। সুতরাং আরবরা যা সহজেই বুঝতে পারে আমরা তা মাথা পেতে নেব। তা আমাদের শিরধার্য এবং সেদিকেই লক্ষ্য রাখব। কিন্তু শাস্ত্রের আয়নায় উদ্ভাবিত যে রহস্যভাণ্ডার বিশেষ শাস্ত্র বিশারদ ছাড়া আর কেউ বুঝবে না সেগুলোকে আমরা কুরআনের লক্ষ্য বলে মেনে নেব না।

সুফিয়ায়ে কিরামের ইশারা-ইঙ্গিত

সুফিয়ায়ে কিরামের তাফসীরেও একই রকম জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তারা যেসব সূক্ষ্ম রহস্যের দিকে ইংগিত করেন, সেসব বিদ্যার সাথে তাফসীরের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। আসল ব্যাপার হলো, কুরআন মাজীদ শ্রবণকালে সুফিয়ায়ে কিরামের মনে বিশেষ ভাব জেগে ওঠে। কুরআনের বিন্যাস আর সুফিয়ায়ে কিরামের আধ্যাত্মিক চেতনা, দু'টো মিলে তাদের মনে বিশেষ এক অবস্থার জন্ম দেয়। তা থেকে তারাই শুধু স্বাদ অনুভব করতে পারে। অন্যের ক্ষেত্রে এটার মূল্যই নেই। যেমন– খাঁটি কোন প্রেমিক যখন লাইনী-মজনুর কাহিনী পড়ে এবং নিজ প্রিয়াকে ভাবতে থাকে আর উভয়ের মাঝে সংঘটিত ব্যাপারগুলোর কল্পনায় ডুবে যায়, আর মজা অনুভব করতে থাকে, তাতে অন্যের কী লাভঃ কারণ এটা

www.pathagar.com

তো তাদের প্রেম কাহিনীর ব্যাখ্যা নয়। সুতরাং সুফিয়ায়ে কিরামের রহস্য জগতও তাফসীর শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত নয়।[১]

এ'তেবার দলীল হওয়ার প্রমাণ

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যা সকলের জানা উচিত। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই এ'তেবার শাস্ত্রকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি নিজে তা অনুসরণ করেছেন, যেন উম্মতের জন্য এটা আদর্শ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যে জ্ঞান ভাণ্ডার দান করেছেন, তা বুঝতে এবং মর্মবাণী অনুধাবন করার জন্য একটা রাস্তা বের হয়ে যায়।

যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ـ

"যে ব্যক্তি দান করল এবং আল্লাহকে ভয় করল।" এ আয়াতের স্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি সৎপথে অর্থ ব্যয় করে, মনে মনে আল্লাহকে ভয় করে চলে, ইসলামের ভাল কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলা তার সৎপথকে সুগম করে দেবেন। আর শেষে তাকে অসীম শান্তিময় জায়গা জান্নাতে পৌঁছে দেবেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের সওয়াব থেকে বেপরোয়া ভাব দেখায় আল্লাহর বাণী ও তাঁর ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করে, আল্লাহ তার জন্য অন্যায় পথকে সহজ করে দেবেন, পরিশেষে জাহান্নামে ফেলে দেবেন। মোটকথা, ভাগ্যবানরা যখন সৎকাজ করে এবং হতভাগারা অন্যায় কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তখন সবার জন্য সে পথ সহজ করে দেন যা তারা নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে। এটাই হলো উপরোক্ত আয়াতের ভাবার্থ। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকদীর নির্ধারিত থাকার ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। (সহীহ মুসলিম-২-৩৩৪)

এ'তেবারের মাধ্যমে আয়াতের দ্বারা এটা জানা যায় যে, তিনি প্রত্যেককে সেই কাজেরই তাওফীক দান করেন এবং সে পর্যায়েই পৌঁছে দেন, যার জন্য তাকে

---

১. তাসাউফের মাসআলাগুলো তিন প্রকার। (১) সরাসরি কুরআন মাজীদ ও হাদীসে রাসূল থেকে উদ্ভাবিত। (২) ফিকাহর প্রসিদ্ধ গ্রহণযোগ্য ও প্রামাণ্য মূলনীতির আলোকে উদ্ভাবিত। (৩) ফিকাহর মূলনীতির বহির্ভূত মনে ঝোঁক ও রুচির ভিত্তিতে সূক্ষ্ম কোন সম্পর্কের আলোকে কুরআন হাদীস থেকে আহরিত। লেখকের এ আলোচনা তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে।

তৃতীয় প্রকারের মাসআলাগুলো যদিও সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর নয়, তবুও যদি তা কুরআন হাদীসের কোন তথ্যের বিপরীত না হয় তাহলে সেসব শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের কোন দ্বিমত নেই। এ ধরনের উদ্ভাবনকেই শরীয়তের পরিভাষায় اِعْتِبَار বলা হয়। বাংলায় যাকে উপদেশ গ্রহণ বা শিক্ষা গ্রহণ বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

সৃষ্টি করা হয়েছে। তার মাধ্যমে ঐ কাজই করান। চাই সে কাজটি জানুক বা না জানুক। এ হিসেবে আগে থেকেই তাকদীর নির্ধারিত থাকার ব্যাপারে এ আয়াতগুলোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ـ

"কসম আত্মার এবং যিনি তাকে সুঠাম করে দেন তার। তারপর তার (আত্মার) অসৎকাজ এবং সৎকাজ তাতে স্থাপন করেছেন।" (শাম্‌স-৭-৮)

স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আয়াত দু'টো বলতে চাচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ পার্থক্য করার বুদ্ধি দান করেছেন। সৎকাজ ও অসৎকাজের চেতনা মানুষের আত্মার সাথেই নিহিত থাকে। এ'তেবারের দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াতগুলোও তাকদীরের প্রমাণযোগ্য। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই করেছেন। (মুসলিম-২-৩৩৪)। আল্লাহ তা'আলাই মহাজ্ঞানী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল কুরআনের দুর্লভ আয়াতসমূহ

কুরআন মাজীদের দুর্লভ স্থানসমূহ খুবই গুরুত্ববহ। হাদীসের কিতাবসমূহে এসব আয়াতের মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ফযীলতের বর্ণনা সমৃদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াত কয়েক প্রকারে বিভক্ত।

১. 'আল্লাহর নিয়ামত ও নিদর্শনাবলী উল্লেখ করে উপদেশ দান' বিষয়ে দুর্লভ আয়াত :

এটা এমন আয়াত বা সূরা, যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী উল্লেখ থাকে। যেমন– আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত এবং সূরা মুমিনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াত।

২. 'অতীত ইতিহাস উল্লেখ করে উপদেশ দান' বিষয়ে দুর্লভ আয়াত :

এটা এমন আয়াত বা সূরা, যাতে অলৌকিক ঘটনাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়। যেমন– আসহাবে কাহাফের ঘটনা বা পরিণত কোন ঘটনা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়। যেমন– সূরা ইউসুফে ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা নিয়ে এমন কোন ঘটনা উল্লিখিত হয়, যাতে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত থাকে। যেমন– হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আমার কামনা হলো– যদি

www.pathagar.com

হযরত মূসা (আ.) আরো ধৈর্যধারণ করতেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ঘটনাটি আরো বিস্তারিত জানাতেন (এবং আরো শিক্ষণীয় ব্যাপার আমাদের সামনে আসত।) (সহীহ বুখারী-২-৬৮৮)

৩. 'মৃত্যু ও তার পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করে উপদেশ দান' বিষয়ে দুর্লভ আয়াত : এমন আয়াত বা সূরা, যাতে কিয়ামতের অবস্থাসমূহ উল্লেখ করা হয়। যেমন– নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি কিয়ামতকে চোখে দেখার মতো করে বুঝতে চায়, সে যেন اذا الشمس كوّرت (সূরা তাকভীর), اذا السماء انفطرت (সূরা ইনফিতার) এবং اذا السماء انشقت (সূরা ইনশিকাক) পাঠ করে। (তিরমিযী ২-১৭১)

৪. 'বিধি-বিধান সম্পর্কিত দুর্লভ আয়াত' :

এটা এমন আয়াত যাতে দণ্ড আইন বর্ণনা করা হয় এবং বিশেষ অবস্থার শর্তারোপ করা হয়। যেমন– ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে একশো বেত্রাঘাতের আইন নির্ধারণ, (সূরা নূর-২), তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দতের জন্য তিন হায়েয বা তিন তুহুর সময় নির্ধারণ। (বাকারা-২৮৮), উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন আইন নির্ধারণ। (নিসা-১১-১২-১৭৬)

৫. তর্কশাস্ত্র বিষয়ক দুর্লভ আয়াত :

ঐসব আয়াত, যাতে অত্যন্ত অতুলনীয় ও আশ্চর্যজনক ভঙ্গিতে কোন সংশয়ের জবাব দেয়া হয়েছে। যেন ঐ সংশয় বা সন্দেহ সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন-৭৮-৮১)। বা সুস্পষ্ট উদাহরণের মাধ্যমে তাদের পুরো চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেমন– مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا... ـ

"তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালিয়েছে...।" (বাকারা-১৭-২০)

এ আয়াতে কাফিরদের প্রকৃত চিত্র খুব চমৎকার আঙ্গিকে অংকন করা হয়েছে। সাথে সাথে মূর্তি পূজার ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। মালিক আর গোলামের তফাৎ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমন নতুন নতুন ও চমৎকার উদাহরণ উপমা উপস্থাপন করে বুঝানো হয়েছে। এসবই দুর্লভ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তেমনি লোক দেখানো আমল কিভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তার আলংকারিক বর্ণনা ও দুর্লভ আয়াতসমূহের একটি। এতক্ষণ যা বলা হলো, দুর্লভ আয়াত এতেই সীমাবদ্ধ নয়। আরো এমন বহু আয়াত আছে, যেখানে তা পূর্ণতা পেয়েছে। কখনো শুধু আলংকারিক বর্ণনাভঙ্গির জন্যও আয়াতে চমৎকারিত্ব দেখা দেয়। যেমন সূরা আর-রহমানের সবগুলো আয়াত। যা দুর্লভ এবং চমৎকার। এজন্য এক হাদীসে এ সূরাকে 'কুরআনের বাণী' বলে অবহিত করা হয়েছে। কোথাও

www.pathagar.com

কোথাও গুনাহগার এবং সৎকর্মশীলদের আকর্ষণীয় চিত্র অংকন করে ও তাকে দুর্লভ করে তোলা হয়েছে।

কুরআনের পেট ও পিঠ

এক হাদীসে কুরআন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

لِكُلِّ اٰيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ ـ

"প্রত্যেক আয়াতের একটি বহির্ভাগ এবং একটি ভেতর ভাগ আছে এবং প্রত্যেক হরফের একটি সীমা আছে। আর প্রত্যেক সীমা জানার একটি স্থান আছে।" (মিশকাত-৩৫)

পবিত্র কুরআনে যে পাঁচটি জ্ঞান বা 'পঞ্চইল্‌ম' স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, আয়াত সাধারণভাবে যা প্রমাণ করে এবং সবাই তার যে মর্মার্থ বুঝতে পারে সেটাই হলো কুরআনের বহির্ভাগ। আর ভেতর ভাগের বিবরণ নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজী নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা। মনে মনে সব সময় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করাই হলো নিয়ামত সম্পর্কিত আয়াতের ভেতর ভাগ।

২. অতীত ইতিহাস উল্লেখ করে উপদেশ দান বিষয়ক আয়াতের ভেতর ভাগ হলো– সেসব ঘটনাবলীতে নেককার বান্দাগণ কেন পুরস্কৃত হয়েছেন এবং বদকার বান্দারা কেন শাস্তির সম্মুখিন হয়েছেন, তা বুঝে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা।

৩. মৃত্যু ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কিত আয়াতের ভেতর ভাগ হলো– জাহান্নামের শাস্তির ভয় ও জান্নাতের শান্তির আশা মনে জাগিয়ে তোলা। জাহান্নামের শাস্তি ও জান্নাতের সুখ শান্তির চিত্র সব সময় সামনে রাখা।

৪. বিধি-বিধান সম্পর্কিত আয়াতের ভেতর ভাগ হলো– আয়াতের ইংগিত-ইশারা থেকে আয়াতের অন্তর্নিহিত বিধি-বিধান জেনে নেয়া।

৫. বিতর্ক সম্পর্কিত আয়াতের ভেতর ভাগ হলো– ভ্রান্ত আকীদাহ-বিশ্বাস, মন্দকাজ ও তার উৎসগুলো জানা এবং তার মত (নব উদ্ভাবিত) মন্দকাজ এবং ভ্রষ্টতাকে সেগুলোর সাথে যুক্ত করা।

আয়াতের বহির্ভাগ বা প্রকাশ্য অর্থ জানার উপায় হলো, প্রাচীন আরবদের ভাষা জানা আর তাফসীর শাস্ত্রের সাথে যেসব হাদীসের সম্পর্ক রয়েছে, তার জ্ঞান অর্জন করা। আর ভেতর ভাগের জ্ঞান আসবে অন্তরের নূর ও প্রশান্তি, প্রখর মেধাশক্তি এবং বুদ্ধির সরলতার মাধ্যমে। "আল্লাহই মহাজ্ঞানী।"

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইল্‌মে লাদুনী বা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহের সমুদ্র থেকে আমার অন্তরে তাফসীর বিষয়ে কয়েক জ্ঞানের স্রোত সরাসরি প্রবাহিত করেছেন। তাফসীরের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অন্যতম হচ্ছে– নবীদের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বা 'তা'বীল'। আমি এ বিষয়ে আলাদা একখানা পুস্তক রচনা করে নাম দিয়েছি– 'তা'বীলুল আহাদীস'। তা'বীল অর্থ হলো– নবীদের যুগে যা ঘটেছে, তার একটা মূলসূত্র আছে, যার সম্পর্ক রয়েছে সেই নবী এবং তার উম্মতদের যোগ্যতার সাথে। সাথে সাথে এ দু'টো ব্যাপার আল্লাহর পছন্দনীয় কর্মপদ্ধতির দিকেও ইঙ্গিত করে অর্থাৎ কাহিনীর ভিত্তি তিনটি :

নবীর (আ.) যোগ্যতা।

উম্মতের যোগ্যতা।

যুগের চাহিদা।

সুতরাং তা'বীল অর্থ হলো, এ তিনটি ব্যাপারের আলোকে ঘটনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। কাজটি সহজসাধ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা দান না করলে তা অর্জন করা অসম্ভব।

যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ.

"আর তিনি 'তা'বীলিল আহাদীস' অর্থাৎ কথাবার্তা যথাযথস্থানে স্থাপন করা শিক্ষা দেবেন।" (ইউসুফ-৬)

পঞ্চইল্‌ম যা কুরআন মাজীদের মূল আলোচনার বিষয়। যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরুতে করা হয়েছে। এটা ইলমে তাফসীর সংক্রান্ত আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান।

ফারসী ভাষায় আমার কুরআনের অনুবাদও খোদা প্রদত্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ। কুরআনের ফার্সী অর্থ করতে গিয়ে শব্দ ও বাক্যের সমযোগিতা, তার প্রসারতা এবং বিশেষ আকারের দিক দিয়ে আরবীর কাছাকাছি। আমি অনুবাদটির নাম দিয়েছি– "ফতহুর রহমান ফী তারজুমাতিল কুরআন।" আলোচ্য বিষয়ে কয়েকটি ব্যাপার নিয়ে বিস্তর আলোচনা থেকে এজন্য বিরত থাকলাম যে, তা পাঠকদের জন্য বুঝা কঠিনই হবে।

www.pathagar.com

ইলমে তাফসীর সংক্রান্ত চতুর্থ জ্ঞানটি হলো- কুরআন মাজীদের বিশেষ ব্যাপারগুলোর জ্ঞান। যদিও অনেকে এ ব্যাপারে আগে কিছু লিখেছেন। তারা এর ব্যাপারে যা লিখেছেন, খুব ভাল হতো, যদি তারা এসব না লিখতেন। তাঁরা কুরআনের বিশেষ ব্যাপারের ভিতে আঘাত করেছেন। অনেকে আবার সেটাকে দোয়া বানিয়ে ফেলেছেন। আবার কিছু লোক সেটাকে যাদু বা তাবিজ আখ্যা দিয়ে ফেলেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ বিষয়ে আগেকার অনুসৃত পথ থেকে সরিয়ে নতুন আরেক পথের দিশা দান করেছেন। তাঁর নামসমূহ, ফযীলতপূর্ণ মহান আয়াতগুলো ও বরকতময় দোয়াসমূহ আমার আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। এ দান আল্লাহ তা'আলা শুধু আমাকেই করেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে আমি যা জানতে পেরেছি, তা একেবারেই অনন্য এবং উত্তম।

আসল কথা হলো, কুরআন মাজীদের প্রত্যেকটি আয়াত, আল্লাহর মহান নামসমূহের ভেতরের প্রত্যেকটি নাম এবং কালামে মাজীদে পাওয়া প্রত্যেকটি দোয়া থেকে প্রত্যাশিত উপকার লাভ করতে হলে এমন কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়, যাকে কোন নিয়ম কানুন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। বরং নিয়ম এটাই যে, যখনই প্রয়োজন হয়, তখন অদৃশ্য ইশারার অপেক্ষা করা। ইস্তেখারার ক্ষেত্রে যেমনটি করা হয়।

তখন যে নাম বা আয়াতের প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়, সে আয়াত বা নাম সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের নিয়মে পাঠ করা।

এ পুস্তকে যা ইচ্ছা ছিল, তা বলে দিলাম। শুরু ও শেষে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সব প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যেই।

মূল কিতাবে 'পঞ্চম পরিচ্ছেদে' 'কুরআনের হরূফে মুকাত্তাআত' (বিক্ষিপ্ত বর্ণমালা, যার অর্থ মহান আল্লাহই অধিক জ্ঞাত) বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তা খুব উপকারী ও প্রয়োজনীয় নয় বিধায় আরবী অনুবাদেও বাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং বাংলা অনুবাদেও তা বাদ দেয়া হলো। (বাংলা অনুবাদক)

www.pathagar.com

ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)

কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি

(আল ফাওযুল কাবীর)

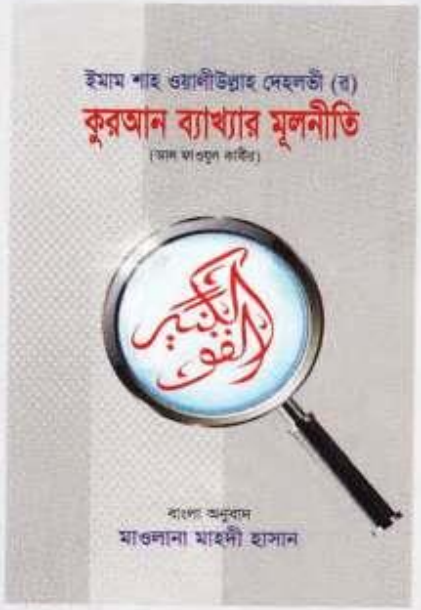

বাংলা অনুবাদ
মাওলানা মাহদী হাসান

ISBN:978-984-90346-0-5

www.pathagar.com